পর্যটক প্রকাশনা ভবনের পক্ষ হইতে
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত
১৬।১এ আরপুলী লেন, কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা আট আনা



প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ হাজরা
বোস প্রেস
৩০, ব্রজমিত্র লেন, কলিকাতা

শ্রীহট্ট জেলার বয়োবৃদ্ধ অক্লান্ত কংগ্রেসকর্মী দেশপ্রেমিক
শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের শ্রীচরণেষু।

রামনাথ

# ভূমিকা

ভূমিকা লিখতে হয় বলে লিখছি না। বলার বিষয়ও অনেক আছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশে পৌঁছার পর সাইকেল পরিত্যাগ করে কলম নিয়ে বসেছিলাম। কায়িক পরিশ্রমী লোক যদি হঠাৎ বসে যায় তবে তার স্বাস্থ্যহানি হয় সে খবর আগে জানা ছিল না। অনেকগুলি বই লেখার পর যখন অন্ধকারের আফ্রিকা লিখতে আরম্ভ করলাম তখন বুঝলাম আমার শরীর দুর্ব্বল হয়েছে, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দেখা দিয়েছে, লো ব্লাড প্রেসারের জ মরমর অবস্থা হয়েছে। এমনি সময় এই বইখানা সমাপ্ত কর পারলাম বলে বড়ই আনন্দিত। ভাষার ত্রুটি থাকবেই। এর জন্য ক্ষমা আমার চাইবার দরকার করে না, সকলেই আমার এসব ত্রুটি মার্জনা করেছেন এবং করবেন এ ধারণা আমার আছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে ভাষার পাণ্ডিত্য চান না তারা চান আমার অভিজ্ঞতা। দেশবাসীর কাছে আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ

গ্রন্থকা

# টাংগার পথে

বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশটি যথা সম্ভব ভ্রমণ করে কেনিয়ারই সব চেয়ে বড় বন্দর মোম্বাসাতে এসে বিশ্রাম করছিলাম। ভ্রমণের গ্লানি দু' তিন দিনের মধ্যেই কমেছিল। পুনরায় পথের ডাক আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল, কিন্তু মোম্বাসা ছেড়ে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। মন চাইছিল আরও কয়েক দিন শহরে থেকে আমার পূর্বপরিচিত নিগ্রো সাথীটিকে খুঁজে বের করে তাকে সংগে নিয়ে আবার রওয়ানা হই। কিন্তু ঘর হতে বের হবার ইচ্ছা হত না। শুয়ে থাকতেই ভালবাসতাম।

সপ্তাহ অতিবাহিত হয় নি, হঠাৎ একদিন বিকাল বেলা আমার পূর্বপরিচিত সাথী তারু এসে হাজির। তারু আমার সংগে কেনিয়ার অনেক স্থান ভ্রমণ করেছিল। আমি তাকে কেনিয়া ভ্রমণের মধ্যপথে বিদায় দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম সে যেন আমার জন্যে মোম্বাসায় অপেক্ষা করে। কেনিয়া ভ্রমণ সমাপ্ত করে মোম্বাসার কোথায় এসে থাকব তাও তাকে বলেছিলাম। তিন মাস পূর্বে তাকে বিদায় দিয়েছিলাম। এই তিন মাসের মধ্যেই তার শরীরে যৌবন এসে দেখা দিয়েছিল।

পেটেল সমাজের ধরমশালাতে এসেই সে আমার রুমে প্রবেশ করে কাছে বসল। তারপর মুখের এমনি একটা ভংগী করল, যা দেখে মনে হল, সে আমার কাছ হতে একটু আদর যত্ন চায়। আমি তাকে কাছে বসিয়ে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দিলাম, তারপর বললাম,

"শরীর একটু ভাল হলেই এবার টাংগার (Tanga) দিকে রওয়ানা হব।"

তারু আমার আরও একটু কাছে এসে আমার হাত এবং পা ভাল করে পরীক্ষা করে ক'টা ডুডু পোকা বের করে ফেল্‌ল এবং সিগারেট পেকেট হতে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে চলে গেল। সে যখন বাইরে যাচ্ছিল তখন তার দিকে আমি চেয়ে বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিলাম এবার ছেলেটার অশান্ত মন শান্ত হয়েছে। সে গিয়েছিল পাক ঘরে। পাক ঘরে সে আমার জন্য গরম জল করে বাথ রুমে রেখে কাছে এসে বলল, "বানা, স্নান করে এস, আমি কতক্ষণ পর তোমার জন্য পাক করব।" আমি যখন স্নান করতে গিয়েছিলাম তখন আমার ম্যানিবেগ বিছানার উপরই রেখে গিয়েছিলাম। স্নান করে ফিরে এসে দেখি তারু আমার ম্যানিবেগ খুলে টাকা গুনছে। আমাকে দেখেই বল্ল "বানা, এবার অনেক পাউণ্ড তোমার কাছে আছে, এবার আরও চারটা সাথী নেব, কেমন রাজী আছ ত?" মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম এবং তাকে একটি শিলিং দিয়ে বাজারে বিদায় করে দিলাম।

তারু খাবার নিয়ে এল। বেশ মোটাসোটা মাছ ভাজা আর ভাত। তাই খেলাম। এরূপ খাবার কিন্তু আমার সহ্য হ'ত না, তাই ফের দুধ নিয়ে আসতে পাঠালাম। পরদিন থেকে তারু আমার গৃহ-কাজের সকল ভারই নিয়েছিল আর আমি মুক্ত মনে নতুন পথের সন্ধান নিতে লাগ্‌লাম।

মোম্বাসা হতে টাংগাতে প্রায় ভারতবাসীই জাহাজে করে যায়, সেজন্য স্থলপথের সংবাদ বড় কেউ রাখে না। যারা সে সংবাদ রাখে তারা নিতান্ত দরিদ্র লোক এবং অল্পবয়সী। তাদের কাছ

থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। একটি ছেলে আমাকে বলেছিল, অনেক মাইল যাবার পর একখানা গ্রাম পাওয়া যাবে এবং সে গ্রাম হতে দরকারী জিনিস কিনবার সুবিধা হবে। এরপর পথে এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাবে না যা হ'তে কিছু কিনতে সক্ষম হব। এই যুবক যা বলেছিল তার অনেকটা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, যারা আর যা কিছু বলেছিল তা একদম বাজে কথা।

মিথ্যা কথা বলে বাহাদুরী অর্জন করা এটা যেন একটা ফেসন। আফ্রিকা সম্বন্ধে আফ্রিকাতেই আমাদের লোকের কাছ থেকে এত বাজে কথা শুনেছিলাম, যা না-শুনাই আমার কর্তব্য ছিল। আমি হয়ত এক দম চুপ করে বসে আছি, এমনি এমন একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক এসে উপদেশ দেওয়ার ভান করে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে এমন কিছু বলতে আরম্ভ করলেন যে, নিগ্রোরা যেন মানুষই নয়, অথচ তারু আমার কাছেই বসে আমার সাহায্য করছে দেখতে পেয়েও তাদের মন উঠছিল না। মোম্বাসা হতে টাংগা মাত্র আটান্ন মাইল অথচ সেই পথটাকে কেউ এক শতে কেউ দুই শতে পরিণত করেছিলেন।

মোম্বাসা হ'তে বিদায় নিতে আমার মোট দশ দিন লেগেছিল। এই দশ দিন শুধু বসেই কাটিয়ে ছিলাম। বিদায় নিবার দুদিন আগে একজন যুবক আমার সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনিও আমার সংগে যাবেন বলে বেশ লম্ফঝম্প করেন। কিন্তু যে দিন আমি শহর ছেড়ে চলে যাই সে দিন তিনি কোথায় ডুব দিয়েছিলেন তার সন্ধান করে উঠতে পারিনি।

আমার প্রচলিত নিয়মমতে ঘুম থেকে খুব সকালে উঠলাম। দরকারী জিনিস সাইকেলের পেছনে বাঁধলাম তারপর তারু এবং অপর সাথী তিন জনকে পেছনে রেখে রওয়ানা হলাম। আমাদের

পথ সমুদ্র-তীর দিয়ে গিয়েছে। সমুদ্র-তীর আমাদের দেশের মত নয়। হঠাৎ যেন এক খণ্ড ভূমি সমুদ্র ভেদ ক'রে উঠেই আকাশ ছুঁইতে চলেছে। এতে আমাদের অসুবিধা মোটেই হ'ল না। সমুদ্রের বাতাস এসে আমাদের শরীর শীতল করতে লাগল। এ দিকটা ভয়ানক গরম সমুদ্রের বাতাস না পেলেও চলতাম নিশ্চয়ই তবে অসুবিধা হ'ত খুব বেশি। আমরা যে পথে চলছিলাম তাকে মোটর-পথ বলা যেতে পারে না, কারণ অনেক স্থানেই পথ ভাংগা এবং পথের উপর বড় বড় পাথর পাহাড়ের গা হ'তে খসে পথের উপর পড়ে রয়েছিল। মাইল দুই চলার পর আর সাইকেলে বসতে পারলাম না। পায়ে হেঁটেই চলতে লাগলাম। ঠিক করেছিলাম, সকালে তিন ঘণ্টা আর বিকালে তিন ঘণ্টা চলে যতটুকু পথ চলা যায় ততটুকুই চলব। সুখের বিষয় প্রথম দিনই সন্ধ্যার সময় আমরা একটি নিগ্রো গ্রামে পৌঁছেছিলাম।

নিগ্রো গ্রাম যদিও ছোট তবুও তাতে লোক ছিল। লোক শিক্ষিত এবং সভ্য। মামুলী একটি খাবারের দোকান ছিল। খাবারের দোকানে ভারতীয় ধরণে মুরগীর তরকারী আর ভাত বিক্রি হচ্ছিল। থাকবারও ছোট ছোট ঘর ছিল। আমরা সকলে একখানা ঘরই ভাড়া করে ফেললাম। তারু তাদের জন্য মিলি-মিলি সিদ্ধ করে নিয়েছিল। মুরগীর তরকারীও তারা একটু একটু খেয়েছিল। নিকটস্থ নালায় স্নান করে এসে আমি নিগ্রো চা খেয়ে বিশ্রাম করতে বসলাম এবং ম্যাপখানা ভাল করে দেখে নিয়ে পাইচারী করতে লাগলাম। এত পরিশ্রম করার পরও তারু এবং তার সাথীরা এক প্রৌঢ় স্ত্রীলোকের সংগে নানা কথা বলে বেশ আমোদ করছিল। শুধু তারাই আমোদ করছিল তা নয়, অন্যান্য যারা গ্রামের খাবারের দোকানে উপস্থিত

ছিল তারাও নানা কথা বলে বেশ আনন্দ উপভোগ করছিল। এখানে দুটি সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছে দেখতে পেলাম; আরব সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতা। আরব সভ্যতা মতে স্ত্রীলোককে কোণ ঠেসা করা, আর ইউরোপীয় সভ্যতা মতে স্ত্রীলোকদের ক্ষমতা দেওয়া। এখানে স্ত্রীলোকগণ কোণ ঠেসা হয় নি তবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা আছে, তবে পুরুষের এক সংগে নয়, পৃথক-ভাবে।

এ অন্চলের লোকের ভাষা সোহেলী। সোহেলী ভাষাতে এতই আরবী শব্দ রয়েছে যে, যারা আরবী ভাষা অবগত আছে তারা অতি সহজে সোহেলী ভাষা বুঝতে পারে। সোহেলী ভাষা সর্বত্র সমান ভাবে প্রচলিত নয়। কোথাও নিগ্রো শব্দ কম আর কোথাও নিগ্রো শব্দ বেশি, এই যা পার্থক্য। বান্তুদের কাছে শুনেছিলাম, বর্তমানে সোহেলী ভাষার রকম বদলে গেছে। নতুন ছাঁচে ভাষার গড়ন হচ্ছে। দৈনন্দিন কাজ চলার জন্য যে সকল শব্দের দরকার সে শব্দগুলি সোহেলী ভাষাতেই রয়েছে। সেই শব্দগুলিকেই শিক্ষিত নিগ্রোরা তাদের নিজের ভাষায় ব্যবহার করছে। এ বিষয়ে পুরাতন মতাবলম্বীরা অনেকেই বাদ সাধছে, কিন্তু আফ্রিকার পুরাতন অন্য ধরণের। বেঁচে থাকবার অধিকার তাদের নাই। এতে কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে।

সোহেলী ভাষার একটি বাহাদুরী আছে, সেই বাহাদুরীটা হল কেপটাউন হতে কাইরো পর্যন্ত গ্রাম্য ভাষার ধাতু একই ধরণের। বিদেশী ভাষা নিগ্রোদের শুধু বিচ্ছিন্ন করেছে। আফ্রিকাতে মিশনারীরা সেই বিচ্ছিন্ন অংশটাকেই "ভাষায় অনেক প্রভেদ" দেখিয়ে দিয়ে অনেকগুলি ছোট খাট ভাষার সৃষ্টি করেছেন।

তাদের এই বাহাদুরী কিন্তু চলবে না, কারণ বর্তমান সময়ের নিগ্রোরা পৃথক্ হয়ে প্রাদেশিকতা করতে রাজি নয়। চাকুরির মোহ তাদের অতি অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। চাকুরির মোহই প্রভেদের মূল কারণ।

রাতে শুইবার সময় আমি মশারী খাটালাম। তারু এবং তার সাথী তিন জন বাইরেই শুয়ে থাকল। আমি ভাবছিলাম গভীর রাত্রে হয়ত বন্য জীব এসে উৎপাত করবে, কিন্তু এদিকে বন্য জীবের কোন উপদ্রব নাই, অথচ আমাদের দেশের লোক অনেকেই বলেছিলেন, এদিকে এত বন্য জীব রয়েছে যে দিনের বেলায়ই সিংহ মানুষ আক্রমণ করে। নেকড়ে বাঘ এদিকে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এসব নেকড়ে মানুষকে বেশ ভয় করে। ঘুম থেকে উঠে মনে পড়ল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগের কথা। তিনি এক স্থানে লিখেছিলেন "যত কয় তত নয়।"

আনুমানিক পনর মাইল পথ আগের দিন আমরা চলেছিলাম। আজ যাতে কুড়ি মাইল পথ চলতে পারি সেজন্য সকাল বেলাই কিছু পাক করে নিয়ে পথে বের হলাম। এ দিকের পথটা যেন একটু ভাল বলেই মনে হতে লাগল। এক সংগে পাঁচ-ছ মাইল পথ চলে আমি পথের কাছে বিশ্রাম করতাম, তারপর তারু এবং তার সাথীরা অনেকক্ষণ পর যখন আসত তখন তারাও কতক্ষণ বিশ্রাম করত, তারপর আবার আমরা পথে বের হতাম। এমনি করে আমরা বেলা চারটা পর্যন্ত পথ চলে একটি শুষ্ক নদীতীরে রাত কাটাবার জন্য মশারী খাটালাম।

নদী সর্বত্র শুকিয়ে যায় নি। আমরা যে স্থানে মশারী খাটিয়ে ছিলাম তার অল্প দূরে জল আটকে রয়েছিল। জল বড়ই পরিষ্কার।

এবং ঠাণ্ডা। শীতল জলে স্নান করে নেবার পর তারু একটা প্রকাণ্ড হাঁড়িতে ভাত বসাল। ভাত হয়ে গেলে নুণ এবং সামান্য তরকারীর সংযোগে খাওয়া হল। খাবার পর একটু বিশ্রাম করেই আমি নিকটস্থ জংগল দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। জংগল মারাত্মক ছিল না। এরূপ জংগল আমাদের দেশেও অনেক আছে। সন্ধ্যার পূর্বে তারু আমাকে জানিয়ে দিল, এই নদীটাই হ'ল কেনিয়ার সীমান্ত। একটু রাত থাকতে এখান থেকে উঠে জংলী পথ ধরে যেতে হবে নতুবা পথের পাশের কাষ্টম অফিসার তাদের ধরবে এবং হয়ত ট্যাক্সও আদায় করতে পারে। এরূপ ঝনঝাট এড়াবার জন্যই জংলী পথ ধরতে হবে। আমি তাকে সম্মতি জানিয়ে মশারীর ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত বোধ হয় দশটা হবে। হঠাৎ আকাশ মেঘে ভর্তি হয়ে গেল। একটু একটু বাতাসও বইতে আরম্ভ করল। তারু উঠে বসল এবং মশারীটা উঠিয়ে বেঁধে ফেলল। আমাদের সকল জিনিস যখন বাঁধা হয়ে গেল তখন প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আমরা নদীতীরে মশারী খাটাই নি, নদীর মধ্যেই মশারী খাটিয়ে ছিলাম। দেখতে দেখতে নদীতে জল বইতে আরম্ভ করল। জল গভীর হ'ল। জলে নানারূপ বৃক্ষ শাখা ভেসে চলতে লাগল। তারপর আর বৃক্ষ শাখা নয়, মোটা মোটা গাছই ভেসে যেতে লাগল। গাছে নানা জাতীয় বন্য জীব আশ্রয় নিয়েছিল। তারাও ভেসে যেতে লাগল। তার মাঝে নানা জাতীয় সাপই বেশি। রাত অন্ধকার ছিল না বলেই এসব আমাদের দেখার সুবিধা হয়েছিল। আমাদের সংগে টিপ বাতি থাকায় দূরের জিনিস দেখার পক্ষে আরও সুবিধা হয়েছিল।

অনেকক্ষণ সেই দৃশ্য দেখে আমরা পথ ধরলাম এবং বন্য পথে চলে সকাল বেলায়ই টাংগা নামক শহরে এসে একটি ধরমশালার বারান্দায় আশ্রয় নিলাম। তখনও লোক বেশ আরাম করে ঘুমাচ্ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল না কাউকে এ সময়ে ডেকে তুলি। তারুর বন্ধুগণ ধরমশালার বারান্দায় আমাদের বসিয়ে রেখেই গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিল এবং বলে গিয়েছিল বিকালবেলা এসে দেখা করবে। সকালবেলায় যখন অনেকেরই ঘুম ভাংগল তখন আমি ধরমশালার সেক্রেটারীর সংগে দেখা করলাম এবং থাকবার বন্দোবস্তও করলাম। সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে একখানা রুম ছেড়ে দিলেন। আমি রুমখানাকে পরিষ্কার করিয়ে শুইবার বন্দোবস্ত করেই শহরটা বেড়াতে বেরুলাম। শহরে বেশীক্ষণ থাকলাম না কারণ তখনও যেন ঘুমে চোখ ভেংগে আনছিল।

ধরমশালায় গিয়েই বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। কোন কিছু ভাববার পূর্বেই গাঢ় নিদ্রা আমাকে আলিংগন করল। বিকালবেলা যখন ঘুম ভাংগল তখন কয়েকজন স্বদেশবাসী আমাকে জিজ্ঞাসা করল "নিগ্রোও কি তোমার সংগ নিয়েছে?" আমি তাদের [illegible]ম নিগ্রোরা আমার সংগ নেয় নাই আমি তাদের আমার সংগে এনেছি। নিগ্রোদের সংগে নেওয়াটা যে মহা খারাপ কাজ সে কথাটাই তারা আমাকে ভাল করে বুঝাতে চেষ্টা করল। আমি কারো কথার জবাব না দিয়ে নিগ্রো পাড়ায় গিয়ে তারু এবং তার তিন জন বন্ধুকে খুঁজতে লাগলাম। এদের খুঁজে বের করতে না পেরে নিকটস্থ হোটেলে গিয়ে খেয়ে যে[illegible] ধরমশালায়ই এসে এদের অপেক্ষায় বসে থাকলাম।

সন্ধ্যা হয় হয়। তখনও পথে ঘাটে বিজলি বাতি জ্বলে উঠেনি; তখন তারু অতি সন্তর্পণে আমার কাছে এসে বসল এবং আমার নিজের রুমে

যেতে বল্লে। দিনটা ছিল ভয়ানক গরম, বাইরে বসে থাকতেই ইচ্ছা হচ্ছিল। তাকে অভয় দিয়ে বললাম "এখানে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, বলত তোমার কি হয়েছে?" তারু বলল "এযে বিদেশ বানা, এখানকার পুলিশ আমাদের পরিচয় পেলেই পোলট্যাক্স চার্জ করবে।" নিগ্রোদের মাথা পিছু দশ শিলিং করে পোল ট্যাক্স দিতে হয়, প্রত্যেক বৎসর। যাদের বাড়ি-ঘর আছে তাদের প্রত্যেক ঘরের জন্যও দশ শিলিং করে দিতে হয় যদি সেই ঘর কোনও মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত থাকে। আমি তারুর হাতে দু' পাউণ্ড দিয়ে বললাম এখন আর ভয় নাই ত? তারু দু'-পাউণ্ড পেয়ে এক দৌড়ে তার বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এল। তারা প্রত্যেকেই বুঝল এখন আর তাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

সে দিন আর কোথাও গেলাম না। তারু আমার জন্য ধরমশালাতেই পাক করল এবং আমার রুমেতেই তারা শুয়ে থাকল। আমার শরীরে বেশ ব্যথা হয়ে ছিল তাই গরম জল দিয়ে স্নান করে আমি শুয়েছিলাম। রাত তখন বোধ হয় দুটা হবে। দু'জন ভারতবাসী আমাকে ডেকে তুলে বল্লেন যদি আমি নিগ্রো সংগ পরিত্যাগ না করি তবে যেন সকাল হবার পূর্বেই ধরমশালা ত্যাগ করি অর্থাৎ এখনই যেন বেরিয়ে যাই। আমি সে আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলাম। গভীর রাতেই আমি একটি আম্রবৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। রাত কাটল বেশ ভালই।

আমি তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। সূর্য্যালোক গাছের পাতা ভেদ করে আমার মুখের উপর পড়ছিল দেখে তারু একখানা কাপড় আমার চোখে বিছিয়ে দিয়েছিল। চারিদিকে মাছি ভন ভন করছিল দেখে অন্য তিন জন লোক গাছের ছোট ডাল দিয়ে মাছিগুলিকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। এ দৃশ্যটা অনেকের চোখেই পড়ছিল। দু'জন

গ্রীক এসে আমার কাছে দাঁড়াতে তারু তাদের কাছে গত রাতের কথা বলল। গ্রীকগণ হেসে বললেন, "এক ঘৃণিত অন্য ঘৃণিতকে ঘৃণা করে" এবং সে কথাটা বার বার যখন ইণ্ডিয়ানদের সামনেই গ্রীকরা বলল তখন একজন স্কুল-মাষ্টার আমাকে জাগিয়ে ধরমশালায় যেতে বললেন। আমি গত রাত্রের কথা তাকে বলায় তিনি আমার হাত ধরে একরূপ টেনেই ধরমশালায় নিয়ে গেলেন। ধরমশালায় গিয়ে আমি ফের ঘুমিয়ে পড়লাম। তারু পাক বসাল, অন্যান্য তিন জন আমার কাপড় পরিষ্কার করতে লাগল।

সেদিনই বেলা দুটার সময় একটি বিদ্যালয়ে লেকচার দিলাম। বিদ্যালয়ে শুধু ভারতবাসীরাই প্রবেশ করতে পারত। ইউরোপীয়রা ঘৃণা ক'রে সেই বিদ্যালয়ে যেত না। আর নিগ্রোদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। শিক্ষক মহাশয়কে অমি সবিনয়ে বললাম "যে সকল নিগ্রো ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও বসতে দেওয়া হোক।" শিক্ষক মহাশয় আমার কথায় রাজি হলেন এবং নিগ্রোদের বসতে বললেন। হিন্দুস্থানীতেই আমার বক্তব্য বিষয় বলেছিলাম। দেখলাম অনেক নিগ্রো হিন্দুস্থানী বেশ বুঝে। লেকচারের শেষে একজন নিগ্রোকে ডেকে এনে আমার কাছে দাঁড় করালাম এবং বললাম, "আমি যা বলেছি তাই তুমি সোহেলীতে তোমার জাতভাইদের কাছে, বলে ফেল।" এতে লোকটি রাজি হল এবং আমি যা বলেছিলাম তাই প্রায় আধ ঘণ্টাব্যাপী বল্ল। তার দুভাষীর কাজ দেখে আমার বেশ আনন্দ হয়েছিল। লেকচার দেওয়া হয়ে গেলে আমার মজুরি গ্রহণ করলাম এবং ফের ধরমশালায় চলে এলাম।

সেদিনই বিকালবেলা একজন ভাটিয়ার সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়।

ভাটিয়া মহাশয় অনেকদিন কলিকাতায় ছিলেন এবং তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীও বাংগালী থাকায় তাঁর সহৃদয়তা আমার প্রতি আপনি এসে পড়েছিল। তিনি বাংলা বেশ ভালই জানতেন এবং আফ্রিকায় গিয়েও সাপ্তাহিক হিতবাদীর গ্রাহক ছিলেন। তিনি কয়েক সংখ্যা হিতবাদী আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন, এতে আমার ভ্রমণ-কাহিনীর সমালোচনা ছিল।

ভাটিয়া ভদ্রলোক কচ্ছের অধিবাসী। ঐতিহাসিক সংবাদ এবং স্থানীয় সংবাদ তাঁর কাছ থেকে প্রচুর পেয়েছিলাম। পাঁচশত বৎসর পূর্বেও যে এদিকে ভারতবাসীর চলাচল ছিল তার অনেক নিদর্শনও আমাকে দেখিয়েছিলেন। গোয়ার ভারতবাসীরা কোনও এক সময়ে পর্তুগীজ অধিকারের আফ্রিকা দখল করে বসেছিল তাও তাঁরই কাছ থেকে শুনেছিলাম। পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামাই না দেখে ভাটিয়া ভদ্রলোক একটু দুঃখিত হলেন বটে; কিন্তু যখন তিনি শুন্‌লেন আমি নিগ্রো এবং ইণ্ডিয়ানদের সংগে একত্রে বসবাস করতে পক্ষপাতী তখন তাঁর আর আনন্দের সীমা রইল না। পরের দিন তাঁর বাড়িতে আমার খাবার নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করলেন। সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাই। যেদিকে নিগ্রোরা থাকে সেদিকে চলেছি দেখে সংগের ভারতীয়রা আমার সংগ পরিত্যাগ করল। আমি আমার নিগ্রোসাথীদের সংগে নিয়ে সেদিকেই চললাম। পথের দুদিকে সারি দিয়ে পাতায় ছাওয়া ঘর। নিগ্রো জেলেরাই সেখানে থাকে। আমরা যখন চলছিলাম তখন আমাদের ডান দিকে একটি নিগ্রো "উদয়-শংকরী" নৃত্য করছিল। আমাকে দেখেই লোকটা আমার কাছে দৌড়ে এসে বলল, "তুমি এদিকে কেন? তুমি যাবে সেদিকে যেদিকে ইউরোপীয়রা তোমাদের পদাঘাত

করে, এদিকের সাগরজলে ভয়ানক লবণ, সাগরতীর দুর্গন্ধযুক্ত, এদিকে এস না, তোমাদের এতে ক্ষতি হবে।” আমার সাথীদের দিকে তাকিয়ে বলল, “এগুলি বোধ হয় তোমার কেনা গোলাম, নিশ্চয়ই কেনা গোলাম।” এই বলেই লোকটা ফের নাচতে লাগল। তারু আমাকে বলল, “বানা, লোকটা পুলিশের চোখে ধুলো দিচ্ছে। এখানে ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে কথা বলে নিগ্রোদের ক্ষেপিয়ে তোলাই এর কাজ, এর কাছ থেকে দূরে থাকাই তোমার উচিত।” কথা না বাড়িয়ে সাগরতীরের দিকে আগিয়ে গিয়ে জলের কাছে বসে সূর্যের শেষ কিরণটুকু সাগরজলে কেমন করে প্রতিবিম্বিত হয় তাই দেখে ফের ধরমশালায় ফিরে এলাম।

রাত্রে কয়েক জন বিশিষ্ট লোক আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁরা এসেছিলেন আমাকে উপদেশ দিতে। নীলপদ্মের জন্মভূমি কুল্‌-মান্‌জার অর্থাৎ মান্দার পর্বত দেখতে আমাকে অনুরোধ করলেন। কুল্‌-মান্‌জার পর্যন্ত একটা রেলপথ এখান থেকে চলে গিয়েছে। চিন্তা করে দেখলাম স্থানটা দেখলে মন্দ হবে না, হয়ত ভালই হতে পারে, তাই স্থানীয় লোকের উপদেশমত তারুকে নিয়ে কুল্‌-মান্‌জারের দিকে চতুর্থ দিন রওয়ানা হই। এদিকে নিগ্রোদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর এক প্রকার কম্‌পার্টমেন্ট থাকে যাতে বসবার জন্য শুধু চাটাই বিছিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্‌পার্টমেন্ট থাকে। সেই কম্‌পার্টমেণ্টে ইউরোপীয়ানরা ভুলেও আসে না। আমি তারুকে নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্‌পার্টমেণ্টেই উঠলাম। তার জন্যও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটই কিনেছিলাম।

গাড়ীতে উঠার পর তারুকে নিয়ে মহা বিপদে পড়লাম। ভারতীয় চেকার তারুকে কোনমতেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসতে দেবে

না। শেষটায় আমিও স্বরূপ ধরলাম। তোমার আইন তোমার কাছে রাখ, নতুবা মেরে হাড় ভেংগে দেব, যখন বললাম তখন লোকটার চৈতন্য হল। চেকার আমাকে "কংগ্রেসী" বলে গালি দিয়ে গাড়ী ত্যাগ করল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় গাড়ী সিসেল বাগিচার ভেতর দিয়ে কুল্ মান্জার ষ্টেসনে গিয়ে পৌছল। তখন বৃষ্টি পড়ছিল প্রবল বেগে। তারু আমাকে ষ্টেসনে বসিয়ে স্থানীয় ধরমশালায় গিয়ে স্থান করে এল। আমি যথাসময়ে পৌছে ধরমশালায় উপস্থিত হলাম। তারু আমার সুখ-সুবিধার ত্রুটি করল না। পরের দিন সকালবেলা আমরা গ্রাম বেড়াতে বের হলাম। গ্রামে প্রায় দোকানদারই ভারতীয় আগাখাঁনী মুসলমান। তারা হিন্দুদের মতই নানারূপ অন্ধ ধারণা পোষণ করে, সেজন্যই অনেকে নীলপদ্ম সম্বন্ধে নানারূপ গল্প বলতে লাগল। কেউ বলে পাহাড়ের উপর হতে নীলপদ্ম বাতাসে ছিঁড়ে নিয়ে আসে আর কেউ বলে নীলপদ্ম কুল মান্জার পর্বতের উপরে একটি সরোবরে জন্মে, যারা পুণ্যাত্মা তারাই নীলপদ্ম দেখতে পায় অন্য কেউ দেখতে পায় না। আমি নীলপদ্ম দেখার আর চেষ্টা করলাম না।

এখানকার প্রায় লোকই সামনের দাঁতগুলিকে বিড়ালের দাঁতের মত ধারাল করে। এদের দাঁত দেখেই অনেকে রামায়ণ সৃষ্টি করে ফেলে। সংবাদ নিয়ে জানলাম এটা এদের একটা ফ্যাশান মাত্র। এখানকার লোক নরমাংস কখনও খেয়েছে বলে আজ পর্যন্ত কেউ শুনেও নি।

ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ার জন্য পাহাড়ে উঠা অসম্ভব হয়েছিল। সাড়ে সাত হাজার ফুট একদম খাড়া পাহাড়টিতে উঠা বড় সোজা কথা নয়। পাহাড়ের অগ্রভাগ তখনও বরফে ঢাকা ছিল অথচ পাহাড়ের নীচে অনবরত ট্রপিক্যাল বৃষ্টি হচ্ছিল। জন কয়েক জার্মান

সিসেল ক্ষেত্রের মালিকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারাও বৃটিশ প্রথামতে ভারতবাসীকে কেরাণী, একাউন্‌ট্যান্ট এসব কাজে নিযুক্ত করেই ভারতবাসীকে সুখী রাখে, মন খুলে কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করে; সেজন্য যে কয়জন জার্মানের সংগে দেখা হয়েছিল তারা নীলপদ্মের কথা আমার কাছে বলা দূরে থাক, তাদের বাংলো হতে যাতে করে আমি চলে যাই সেজন্য সামান্য দুএক কথা বলেই বিদায় দিয়েছিল। লজ্জায় এবং ঘৃণায় আমার মন এত দুর্বল হয়েছিল যে, নীলপদ্মের কথা ভুলে গিয়ে ফেরত গাড়ীতে সেদিনই টাংগাতে ফিরে এসেছিলাম। তবে নীলপদ্ম বলে এক রকমের পদ্ম আছে একথা অতি সত্য। টাংগানিয়াকায় যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন কয়েকজন গরীব জার্মাণ এবং এক জন জার্মাণ ডাক্তার আমাকে নীলপদ্ম দেখিয়েছিলেন। পদ্মগুলির পাপড়ী গাঢ় নীল এবং সহজে শুকিয়ে যায় না। এক শত শিলিংএ তাঁরা একটি পদ্ম বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন। আমি কিন্তু পয়ষট্টি টাকা সেজন্য খরচ করতে রাজি ছিলাম না।

---

# জান্‌জিবার

লোকে বলে দুঃখের পর সুখ হয়। কুল-মান্‌জারে জার্মানদের কাছ থেকে অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে যখন টাংগায় এলাম তখন হঠাৎ মনে হল জান্‌জিবারের কথা। ভাবছিলাম সেখানে গেলে কিছুটা শান্তি পাব। জান্‌জিবার যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। তারুকে পায়ে হাঁটা পথে দার-এ-সালাম পাঠিয়ে দিয়ে টাংগা হতে জান্‌জিবারের দিকে রওয়ানা হলাম। তখন জান্‌জিবারে আরব এবং ভারতবাসীতে বেশ এক চোট লড়াই হয়ে গেছে। আরবও মুসলমান আর যারা আরবের সংগে বিবাদ করেছিল তারাও মুসলমান। এক্ষেত্রে ইস্‌লামের ভ্রাতৃভাবের কোনরূপ অস্তিত্ব আছে বলে বুঝলাম না। স্বার্থ বড়ই বালাই।

টাংগা হতে জাহাজে বসার কতক্ষণ পরই এক দল বড় মাছের সাক্ষাৎ পেলাম। মাছগুলি কুড়ি হাতের কম লম্বা হবে না। সংখ্যায় কয়েক লক্ষ যদি বলি তবে কমই বলা হবে। যতক্ষণ দৃষ্টি যায় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু দেখি বৃহৎ মাছ হঠাৎ জলের তল থেকে ভেসে উঠে জাহাজের সংগে চলছে। এই মাছগুলি নাকি লোহিত সাগর থেকে এসেছে এবং তারা যাবে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে, এ কথাটাই অনেকে বলেছিল। বেশ কতক্ষণ খালি চোখে মাছের খেলা দেখে সুখীই হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একজন লোক বলে উঠল ঐ বাঁ-দিকে পেম্বা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপটা বেশ সুন্দর বলেই মনে হল, কিন্তু এখানে ভারতবাসী আরবদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে শুনে বড়ই দুঃখ হল।

যারা অত্যাচারিত হয়েছিল, তারাও মুসলমান। ভারতবাসী তুমি যে সাজে সাজ তাতে ক্ষতি নাই তুমি শুধু ভারতবাসীই। তোমাদের দুঃখে আমার দুঃখ হবেই। জাহাজে পেম্বা দ্বীপের একজন ভারতীয় বাসিন্দাও ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পেম্বা সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তাই লিপিবদ্ধ করলাম।

পেম্বা দ্বীপে যে কয়টি ভারতীয় পরিবার বাস করত তারা সকলেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং জাতে গুজরাতী। তারা সকলেই লবংগের ব্যবসা করত এবং তাদের নিজেরও লবংগের বাগিচাও ছিল। কোন্ যুগে যে এরা লবংগ ব্যবসা করতে পেম্বা দ্বীপে গিয়েছিল তা অনেকেই ভুলে গিয়েছিল। অনেকে তাদের মাতৃভাষা গুজরাতীও বলতে পারত না।

ভারতবাসী, তুমি তোমার মাতৃভাষা ভুলে যাও, তুমি অপরের ধর্ম গ্রহণ কর কিন্তু তুমি ভারতবাসীই, আরব তোমাকে কখনও মুসলমান বলে ডাকবে না তোমাকে হিন্দিই বলবে। পেম্বাতে তার নমুনা আরবগণ দেখিয়েছিল। আরবগণ সর্বপ্রথম বলতে আরম্ভ করছিল, পেম্বার আসল বাসিন্দা আরব, অতএব হিন্দিরা পেম্বার বাস করবার অধিকার পেলেও লবংগ ব্যবসা তারা কোন মতেই করতে পারে না। আইনের প্রণেতা এবং আইনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিল বৃটিশ। লবংগ ব্যবসা হতে যদি ভারতবাসীকে উচ্ছেদ করতে হয় তবে আইনমতে উচ্ছেদ করা যায় না। শক্তির ব্যবস্থা করতে হয়। শক্তির ব্যবহারও আইনমতে নিষিদ্ধ। তবে কি করে ভারতবাসীকে লবংগ ব্যবসা হতে উচ্ছেদ করা যায়? সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সে উপায় ভাল করেই জানত। সেই উপায়টি হ'ল দাংগা বাধিয়ে দেওয়া। আরবগণ পেম্বার ভারতীয় মুসলমানদের আক্রমণ করে অনেকের তিন পুরুষের নির্মিত বাসগৃহ উৎখাত করে দিল। পুলিশ বোধ হয় পেম্বায় ছিল

তবে তাঁদের দেখা পাওয়া যায়নি। আরবগণ বেশ করেই তাদের বাসনা পূরণ করে নিয়েছিল।

এবার জান্জিবারের ইণ্ডিয়ানদের পালা। এখানেও কি তাই হবে ? না এখানে তা হতে পারল না। শিখ এবং হিন্দুস্থানী সেখানে ছিল। শিখরা আদেশ করল "ভারতীয় মুসলমান ভাই তোমরা লাল ফেজের বদলে কালো ফেজ ব্যবহার কর নতুবা দাংগার সময় হয়ত তোমাদের উপরই ভুল করে লাঠি চালিয়ে দেব।" ভারতীয় মুসলমান শিখদের আদেশ দুঘণ্টার মাঝে তামিল করল। তারপর আরম্ভ হল দাংগা। আরবের উর্ধে উত্থিত শাণিত-লোলুপ ছোরা হাতেই রয়ে গেল। ভারতীয় মুসলমানের এক বিন্দু রক্ত সেই ছোরা স্পর্শও করতে পারল না। দাংগা আর হল না, কারণ এ যে জব্বরে জব্বরে লড়াই। যখন সমানে সমানে কিছু ঘটে তখন সাধারণ জ্ঞান আপনি আসে। আরব বুঝল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের ধামা ধরলে চলবে না, ভারতবাসী তাদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করবেই, অতএব আর ঝগড়া করে লাভ নাই। যা করবার পুঁজিবাদী বৃটিশরাই করুক। কিন্তু এর পেছনে যদি শক্তি না থাকত তবে সুন্দর সমতল জান্জিবার শহরে একটি ভারতবাসী বেঁচে থাকত কি না সন্দেহ।

গল্পের শেষ হল। আমাদের ছোট্ট জাহাজ ও সন্তর্পণে এসে জান্জি-বারের তীরে ভিড়ল। আমি দূর থেকে যেমন আগ্রহের সহিত জান্জিবার দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিলাম তেমনি কাছে গিয়েও সে দৃশ্য দেখেই সময় কাটাচ্ছিলাম। যাত্রী নেমে যাচ্ছিল, আমি সকলের শেষে নামলাম, কারণ আমি ভাল করেই জানতাম আমার মত দুর্বলের উপর কাস্টম বিভাগের খরদৃষ্টি পড়বেই। আমার অনুমান সত্য হল। আমাকে একশত শিলিং অর্থাৎ পাঁচ পাউণ্ড জমা রেখে

তীরে নামতে হল। কাস্টম অফিসার ছিলেন ভারতবাসী। তিনি আমার প্রতি জুলুম করতে কসুর করেন নি। শরীর দুর্বল ছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি, তারপর এল কাস্টম অফিসারের জুলুম। এতে শরীর এবং মন উভয়ই তেতে গিয়েছিল। তীরে নামার পর থর থর করে কাঁপছিলাম। সাইকেলে না উঠে হেঁটেই চলছিলাম।

শরীর দুর্বল, মন আধমরা এর মাঝেও.. জান্‌জিবারের সৌন্দর্য আমাকে যেন গ্রাস করতে বসেছিল। পথে দেখা হল দুটি যুবকের সংগে। তারাই এসে আমার সংগে কথা বলল। তাদের বললাম "যদি দয়া করে একটা হোটেল অর্থাৎ থাকার স্থান দেখিয়ে দেন তবে বাধিত হব।" তারা ভারতীয় মুসলমান। তারা আমাকে বললে হোটেলে যাবেন কেন? এই যে কাছেই আর্য সমাজ, সেখানেই থাকতে পারেন, চলুন আমরা আপনাকে আর্য সমাজের সেক্রেটারীর বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ত্রিপাটীর বাড়ীতে। ত্রিপাটী অসুস্থ ছিলেন। ছেলেগুলিকে বলে দিলেন তারাই যেন আর্য সমাজের দরজা খুলিয়ে দেয়। ছেলেরা প্রেসিডেন্টের বাড়ী গেল এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে দরোয়ানের কাছে এসে দরজা খুলে দিতে বলল। দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে আমার জন্য মস্ত বড় একটা রুম পরিষ্কার করে দিল। আমি রুমে গিয়ে আমার যথাসর্ব্বস্ব রেখে স্নান করে ঐ ছেলেদের সংগে করে একটা ভাতের দোকানে গিয়ে খেয়ে এলাম। তারপর বিশ্রাম। সে বিশ্রাম কি আরামের!

পরের দিন আমি বসেছিলাম একটা চেয়ারে আর চেয়ে রয়েছিলাম সাগরের দিকে। সাগরের দৃশ্য চেয়ারে বসে অতি অল্পই দেখা যাচ্ছিল তবুও চেয়ে থাকা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আমার শরীর ছিল ভয়ানক দুর্বল। কোথাও বসলে আর উঠতে ইচ্ছা করত না, তাই

বসে রয়েছিলাম আর দেখছিলাম যা আসে দৃষ্টিপথে। কতক্ষণ পর একটি ছেলে এসে আমার কাছে বসল। সে আমাকে নানাদেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। আমি সংক্ষেপে কথার জবাব দিচ্ছিলাম দেখে বলল 'রামনাথ, তুমি ভয়ানক পরিশ্রান্ত এখন আমার কথা শুন। গুজরাতীরা নাম ধরে প্রায় লোককেই ডাকে এবং "তমে" শব্দ ব্যবহার করে। নাম ধরে ডাকা এবং অত্যধিক সম্মান না দিয়ে কথা বলার প্রচলন ভারতে ছিল। পুরাতন দ্রাবীড় রাজত্ব কালে রাজার সম্মান এবং দেবতার সম্মান করতে গিয়ে ভাষার অপব্যবহার করা হত না। ভাষার অপব্যবহার মোগল যুগে আরম্ভ হয়। মন যখন দাসত্বের কালিমায় ভরে যায় তখন সে মণিবকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আবল তাবলই বকে। ভীতুর কথায় সম্মান বাড়ে না। এখনও উত্তর-ভারতে তার আঁচড় আছে। কিন্তু গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে এবং দাক্ষিণাত্যে তার আঁচড়ও পড়েনি সেজন্যই একটি ছেলে আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পেরেছিল।

আমি ছেলেটির কথায় সাড়া দিলাম। সে বলল ঐ যে দেখছ দেওয়াল এ পর্যন্ত হল আর্য সমাজের যায়গা কিন্তু দেওয়ালটা আর্য সমাজের নয়। ঐ দেওয়ালটার গায়ে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর ছিল তাতে এনে রাখা হত যত সুন্দরী নিগ্রো রমণী। ওদের বিক্রি করার পূর্বে ক্রেতা তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করত। তাদের সংগে শিশু থাকলে সেই শিশুকে সমুদ্রে ফেলে দিত, তারপর হত বিক্রি। দেওয়াল জড় পদার্থ না হয়ে যদি মানুষ হত তবে বলতে পারত আমি যা বলেছি তার সবই ঠিক। তোমার শরীর ভাল হোক তারপর নিয়ে যাব প্রকাণ্ড একটা গুহায়। সেই গুহায় নিগ্রোদের পুরে রাখা হত। কেউ বাতাসের অভাবে মরত, আর কেউ বা সর্পাঘাতে ইহজীবনের মায়া কাটাত।"

আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আরবরা নিগ্রোদের প্রতি বেশ অত্যাচার করেছিল ; এটা আমি মেনে নিলাম, কিন্তু বলতে পার আরবরা কেন এত অত্যাচার করেছিল ?' ছেলেটি বলল, 'টাকা পাবার জন্য।' টাকা পাবার জন্য মানুষ মানুষের উপর কত অত্যাচার করতে পারে তা তুমি নিজের মুখেই বলেছ, কিন্তু ঐ যে টাকারূপী শয়তানকে যারা রক্ষা করে তাদের ধ্বংসের জন্য কি করেছ ? ছেলেটি আমার মুখের দিকে শুধু চেয়েই রইল, তারপর চলে গেল, যে পথে সে এসেছিল। আমি তার আসা এবং যাওয়ার একখানা ছবি এঁকে আমার মনের কোণে টাংগিয়ে রেখেছিলাম এবং দেওয়ালটার দিকে আর না চেয়ে চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে বসেছিলাম। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সাগরের ঢেউ বেলাভূমিতে বেশ জোরেই আঘাত করছিল আর সেই শব্দ আমি আনমনা হয়ে শুনছিলাম।

দুদিন কেটে গেল, তারপর আমি আমার সাইকেলখানাকে একটু মেরামত করে শহর বেড়াতে বের হয়ে পড়লাম। শহরে অলিগলি পথ। বেনারসের গলির সংগে বেশ সম্বন্ধ আছে। বেনারসের গলি অপরিষ্কার আর জান্জিবারের গলি পরিষ্কার। গলিতে গলিতে নানাপ্রকারের চায়ের দোকান। হিন্দুদের পরিচালিত এবং হিন্দুদের জন্য কতকগুলি চায়ের দোকান দেখলাম। এসব দোকানে গেলেই মনটা দমে যায়, মনে হয় যেন কোন প্রাণহীন স্থানে এসেছি আর সর্বজনীন চায়ের দোকানে গেলে মনে হয় যেন প্রাণে প্রাণ পেয়েছি। দুটা মাত্র চায়ের দোকানে গিয়েই শহরের বাইরে চলে গেলাম।

যেদিকে সমুদ্রতীরে দরিদ্রদের বাস শেষ হয়েছে তারই পর একটা পিন্‌জরাপোল। এখানে পিন্‌জরাপোল মানে হল, যে সকল গরু কশাই বাড়ী না গিয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে তিলে তিলে অথবা তাদের হবে

প্রাকৃতিক মৃত্যু। হিন্দু যেমন নিজের প্রাকৃতিক মৃত্যু চায় তেমনি চায় তাদের রক্ষিত জীবজন্তুরও প্রাকৃতিক মৃত্যু হোক। পিন্‌জরাপোলের কাছে দাঁড়িয়ে শুধু তাই ভাবছিলাম তারপর সেদিনের মত ভ্রমণ সমাপ্ত করে নিগ্রোপাড়ায় গিয়েছিলাম।

এখানে সবাই আমার দিকে চেয়েই রইল, কেউ কথা বলল না, এবং কথা বললেও আমি বুঝতে সমর্থ হতাম না। নিগ্রোপাড়া হতে ফেরবার পথে একটি গুজরাতী স্কুল দেখতে পেয়ে শিক্ষক মহাশয়ের সংগে দেখা করলাম। শিক্ষক মহাশয় একজন গুজরাতী। তিনি আমার সংগে ভাংগা হিন্দী এবং গুজরাতী ভাষায় কথা বললেন এবং ছাত্রদের কাছে আমার অভিজ্ঞতা বলতে অনুরোধ করলেন। পরের দিন তাঁর স্কুলে গিয়ে হিন্দুস্থানীতে ছাত্রদের আমার ভ্রমণ-কাহিনী কিছু বলেও ছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম এখানকার গুজরাতী ছোট ছেলেরা তাদের মাতৃভাষা মোটেই বলতে পারে না, তারা বলে সোহেলী। যাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গুজরাতী বলতে পারে সেজন্য শিক্ষক মহাশয়গণ সোহেলী ভাষার একটি কথাও স্কুলে অথবা স্কুল প্রাংগণে উচ্চারণ করতে পারতেন না। যদি করেন এবং কর্তৃপক্ষ যদি জানতে পারেন তবে কর্মচ্যুত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

অতি সুন্দর সংবাদ। পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে তিনটি ভাষা গজিয়ে উঠছে। ইংলিশ, সোহেলী আর গুজরাতী। গুজরাতী মুসলমান সোহেলী ভাষা গ্রহণ করতে বসছিল, কারণ হিন্দুরা তাদের সংগে প্রত্যেক কাজেই পৃথক হয়ে থাকত। হিন্দুদের পৃথক হয়ে থাকার প্রত্যুত্তরে গুজরাতী মুসলমান মাতৃভাষা পরিত্যাগ করাই ঠিক করেছিল কিন্তু আরবের ব্যবসার এক চপেটাঘাতেই গুজরাতী মুসলমানদের আক্কেল ফিরে এসেছিল। তারা শুধু গুজরাতী ভাষা পুনরায় গ্রহণ করল না, সোহেলী

ভাষা পরিত্যাগ করল। হিন্দুস্থানী ভাষার সবাক চিত্রকেও গুজরাতীরা বলতে লাগল "গুজরাতী ফিলিম্ আউছে" অর্থাৎ গুজরাতী সবাক চিত্র এসেছে।

কয়েক দিন পর জান্জিবারের প্রসিদ্ধ গহ্বরটি দেখতে বের হলাম। পথের দুপাশে লবংগের গুদাম। গুদাম হতে লবংগের গন্ধ আসছিল। সে গন্ধ বড়ই কটু। গন্ধটা আমি ভাল করে অনুভব করছিলাম আর ত্রিপাটীকে জিজ্ঞাসা করছিলাম এত লং জমা হয়ে রয়েছে কেন? ত্রিপাটী বলছিলেন—ভারতবাসী আর লং কিন্‌ছে না তাই গুদাম ভর্তি হয়ে রয়েছে। যাদের একমাত্র উৎপন্ন দ্রব্য হল লং এবং যে লং-এর একমাত্র ক্রেতা হল ভারতবর্ষ সেই দেশের লোকের সংগে আরবগণ বাঁধিয়ে দিল ঝগড়া কোন্ সাহসে? ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে ফল যা হল তা চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। আরব ভাল করেই বুঝেছিল এ ঝগড়ায় তাদের পোষাবে না, এখন পুঁজিবাদী বৃটিশ এবং পুঁজিবাদী হিন্দীতে লড়াই হোক, এই মতলব ঠিক করেই আরবগণ লং-এর ব্যবসা অর্থাৎ কুকুরের মত আক্রমণ করা হতে বিরত হয়েছিল। আরবদের বাহাদুরি দিতে হবেই, কারণ আরবরা অতি সহজে অনেক কথা বুঝে ফেলে।

শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে পেলাম সেই ঐতিহাসিক গহ্বর। গহ্বর প্রকাণ্ড। আমাদের সংগে টিপবাতি ছিল। আমি টিপবাতি হাতে করে গহ্বরে প্রবেশ করলাম। ক্রমেই অন্ধকার বাড়তে লাগল এবং গহ্বরের আকৃতিও বড় দেখাতে লাগল। অনেকক্ষণ চলার পর মনে হল যেন আর বাতাস পাচ্ছি না এবং অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি। কাছেই দুজন নিগ্রো যুবক বসে কি লিখছিল। আমি তাদের কাছে না বসে আরও একটু আগে গিয়ে বসে বিশ্রাম করলাম, তার পর আগিয়ে চললাম। আরও কতক্ষণ হেঁটে গিয়ে দেখলাম একস্থানে জল জমা হয়ে

রয়েছে। জল অব্যবহার্য। অনেকক্ষণ বসে জলের ওপারে কি আছে লক্ষ্য করে দেখলাম, যা আছে তা শুধু পাথর আর জল আর কিছুই নাই। আর যদি কিছু থাকেই বা তবে তা আমার অজ্ঞাতে রয়েছে, সে সম্বন্ধ বাজে কথা বলে কোন লাভ নাই। গহ্বর থেকে বের হয়ে বিশুদ্ধ বায়ু পেয়ে মনে হল যেন নব জীবন পেয়েছি। গহ্বর দেখার পরও আরবদের প্রতি আমার রাগ হল না, কারণ তখনকার দিনে নরহত্যা মামুলী কথা ছিল। আরবগণ হয়ত হাজার দশেক লোক গহ্বরে ফেলে মেরেছিল আর আমরা নিজেকে সভ্য বলে পরিচয় দিই অপরের যথাসর্বস্ব অপহরণ করে অপরকে পথে বসিয়ে, অকালে যমালয়ে পাঠিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করি, উপরন্তু ধর্মকর্মও করি। আমরা যে অনুপাতে অপরের উপর অনর্থক অত্যাচার করি আরবগণ তার শতাংশের এক-অংশও করে নি। আরব নিগ্রোদের আপন করে নিয়েছে আর আমরা আপন ভাইকে পদাঘাত করে বিধর্মী বলে, ছোট জাত বলে তাড়িয়ে দিচ্ছি। ত্রিপাটী যখন জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন মনে হল? আমি বললাম, "আমরা হরিজনের প্রতি যে অত্যাচার করছি তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। এটা দেখুক এসে আরব, আর ভাবুক তাদের পূর্বপুরুষদের দুর্দান্ত উগ্রপ্রকৃতির কথা, আমাদের এটা দেখা দরকার নাই, আমাদের নিজের ক্ষত দেখাই দরকার।"

প্রকাণ্ড গহ্বরটা দেখা হল, তারপর যা দেখেছি সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে, কিন্তু পরের দিন আবার একটা মহান্ কিছু দেখার জন্য নিমন্ত্রণ এল। সেটা কিন্তু বেশি দূরে নয়। বৃটিশ ডিমক্রেসীর সবচেয়ে বড় আস্তানার কাছেই। মিউনিসিপালিটিই হল বৃটিশ ডিমক্রেসীর আরম্ভ আর এখানেই বোধ হয় শেষ। তারপর এসে দেখা দেয় মাইনরিটি আর মেজরিটি। মিউনিসিপালিটির

সামনেই দেখলাম একটা অসমতল স্থান। সেই স্থানে নাকি জান্‌জিবারের আরব রাজা নিগ্রোদের হাত-পা বেঁধে কুকুর দিয়ে তাদের মাংস খাওয়াতেন। কথাটা বল্লেন একজন গণ্যমান্য লোক। আমি আর সে-স্থানে দাঁড়ালাম না। কয়েকজন শিক্ষিত নিগ্রো আমার মতামত জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের লক্ষ্য করে বললাম, "তোমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন গোলাম, তোমরা গোলাম হয়ো না; গোলামী যারা করে তাদের এ রকম দুর্গতিই হয়।" যিনি আমাকে স্থানটা দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে বললাম "এরূপ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন না।"

একটা সিংহ একটা গরুকে খেয়ে ফেলেছে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব না, আমি মাথা ঘামাব যদি একটা মানুষ অন্য একটা মানুষের প্রতি অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে। নিগ্রোও মানুষ এটা আমি স্বীকার করি কিন্তু তখনকার দিনে তারা অসহায় ছিল। অসহায়কে তখনকার দিনে সভ্যরাও হত্যা করত। এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, এখন যাতে করে অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক শিক্ষিত হয় তারই চেষ্টা করা উচিত। পুরানো ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে লাভ কিছুই হবে না, হবে লোকসান। অতএব ক্ষমা করুন, আমি আর আপনাদের নির্দ্ধারিত কোন স্থানে যাব না, আমি আমার ইচ্ছামতে শহর ঘুরে বেড়াব।

বৃটিশের জমিদারী চালাবার বুদ্ধি বাংগালী জমিদারদেরও হার মানিয়েছে। জান্‌জিবার প্রকৃতপক্ষে বৃটিশেরই জমিদারী, তবে সুলতানের নামে বেনামা করা হয়েছে। বেনামী করা সম্পত্তি বৃটিশ বেশ ভাল করেই শোষণ এবং শাসন করে। আরব সুলতান একটি শিশুর মত বেনামী সম্পত্তির মালিকের ভূমিকায় উঠা-বসা

করেন। এরূপ বেনামী সম্পত্তি বৃটিশের ভারতেও অনেক আছে। অতএব সুলতান কেমন এবং কিরূপে তিনি রাজ্য শাসন করেন জানবার জন্য আমি মোটেই চেষ্টা করি নি। তিনি কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছেন তা জেনেছি এবং জেনে সুখী হয়েছি। তাঁকে মাসিক বেশ মোটা এলাউন্সই দেওয়া হয়।

সুলতানের সংগে একদিন পথে দেখা হয়ে যায়। লোকটির চোখের তারা নীল, নাক খগনাসা, আজানুলম্বিত বাহু, কপাল বেশ উঁচু. দেখলেই মনে হয় লোকটি জাতে "সিমেটিক"। বাংলা দেশের লোক যেমন গৌরাঙ্গ ভক্ত এখানকার লোকও বিশেষ করে অর্দ্ধ-নিগ্রো এবং ভারতীয়রা সেইরূপ 'সিমেটিক' অথবা গৌরাঙ্গ শ্রেণীর লোকের পদানত হয়ে থাকতে ভালবাসে। সেজন্যই অর্দ্ধ-নিগ্রো এবং ভারতীয়রা সুলতানকে শুধু সম্মান করে না, রীতিমত ভক্তি করে। রাজভক্তি হল পদদলিত জাতির পৈতৃক সম্পত্তি।

সুলতানের বাড়িটাকে একটা দুর্গ বললেও বেশী বলা হবে না। আরবগণ দুর্গকে "কোতা" বলে। জান্‌জিবার সমুদ্র হতে অতি অল্প উঁচুতে অবস্থিত বলেই দুর্গটি সমুদ্রতীরেই গঠন করা হয়েছিল। আরবদের তখনকার দিনে সমুদ্রেও আধিপত্য ছিল সেজন্যই দুর্গও সমুদ্রতীর থেকে দূরে তৈরী করা হয় নি। দুর্গের পেছনদিক দিয়ে একটা পথ গিয়েছে। দূর থেকে সুলতান দর্শন করে ছোট পথ ধরে চললাম। প্রথমত কতকগুলি দোকান পেলাম। দোকানগুলির মালিক আরব। এদিকের আরবগণ দাড়ি-গোঁফের পক্ষপাতী নয়। এখানকার ভারতীয় এবং নিগ্রো মুসলমানদের মাঝে প্রবল ধারণা রয়েছে দাড়ি-গোঁফ না রাখলে স্বর্গে যাওয়া যায় না। সেজন্যই বোধ হয় এখানকার আরবদের হিন্দিদের মধ্যে কেউ কেউ বিধর্মীও বলে।

আরব পাড়া ছাড়িয়ে একটি খাবারের দোকানে গিয়ে বসলাম। নানা রকমেরই খাবার তৈরী ছিল। মাছ, মাংস, ডিম, ভাত, রুটি, ঘি দিয়ে ভাজা রুটি, পোলাও, পায়স এবং নানারকমের সব্জীও ছিল। মাছ যেমন নানা রকমে পাক করা হয়েছিল, মাংসও তেমনি নানা রকমের। জান্জিবারে গোমাংসের প্রচলন অধিক অথচ এখানকার লোক প্রচলিত কথামতে দূষিত রোগে কষ্ট পায় না। সেনিটেশন জান্জিবারে বেশ উত্তমরূপেই রক্ষা করা হয়। নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান, অর্দ্ধ-নিগ্রো সকলেরই শহরে থাকার জন্য যে অভিজ্ঞতার দরকার তা প্রত্যেকেরই আছে। খাবারের দোকানে কেউ থুথু ফেলে না, গ্লাসে হাত ধোয় না, উচ্ছিষ্ট গ্লাস যে পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে না আসে সে পর্যন্ত তা কেউ ব্যবহার করে না। নিগ্রো এবং আরবদের মাঝে এত মার্জিত আচারব্যবহার পাব বলে আমার ধারণাও ছিল না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে বসে কথা বলতেও আনন্দ হয়। কিন্তু কি কথা বলব ? এখানকার লোক অতি কম কথা বলে এবং যা বলে তাও অতি দরকারী। আমার তরফ থেকে কথা বলার উপায় ছিল না

খাবারের দোকানের বয়গুলি অতীব বাক্যবাগীশ এবং ধীরে কথা বলে। তারা নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ। তারা আমার আদেশ শুনছিল। তারা নানা ভাষাভাষী। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল "মিষ্টার কি পর্যটক ?" আমার জবাব তার প্রতিকূলে পেয়ে সে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। গ্রাহকদের আমার কথা শুনাতে ছিল। খাবারের দোকানে চাঞ্চল্য এসে দেখা দিয়েছিল। বৃটিশের গোপনীয় পুলিশ এল। কথা বন্ধ হয়ে গেল। জান্জিবারের লোক জানতে বাধ্য হয় কে কেমনতর মানুষ, কারণ এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ হলে প্রচুর কষ্ট পেতে হয়। লোকগুলি যেমন কর্মী তেমনি তাদের কর্মপ্রেরণা লোপ করার জন্য

উপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল। তারা সকলেই সাধারণ লোক। "চাকরটাও" নাই "ঠাকুরটাও" নাই, ছোটলোকের ছেলেও নাই, বড়লোকের ছেলেও নাই, সকলেই মানুষ, সকলেই আপন শক্তি পাবার জন্য উদ্‌যোগী।

বড় সুন্দর দৃশ্য। ঘরখানা একেবারে নীরব। মাঝে মাঝে তরকারী খারাপ হয়েছে, ভাত পুড়ে গেছে, এসব মন্তব্যই করা হচ্ছিল। কিন্তু কেউ বলে নি জিনিষের দাম বেড়ে গেছে। আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম অন্য আর একটা বিষয়। এমন কি চটপটে কথায় পারদর্শী পুলিশটাকে জিজ্ঞাসা করলাম "যদি খাদ্য বিক্রী না হয় তবে তা কি ফেলে দেওয়া হয় না?" লোকটি ঘাড় নেড়ে, হাত নেড়ে তার পর চোখে মুখে এবং নাকের সাহায্যে "হাঁ" কথাটা বুঝিয়ে দিল। যাদের মনে ময়লা জমে তারাই বেশি কথা বলে। নয়ত একদম চুপ করে থাকে। এই লোকটারও মনের কোণে ময়লা জমেছিল। এরূপ লোক অনেক সময় আমাকে অনেক নতুন নতুন সংবাদও সরবরাহ করত। এই লোকটি আমাকে একটি বাংগালীর সন্ধান দিয়েছিল এবং সে নিজে আমাকে বাংগালী লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

এ দিকের পথ বড়ই অপরিষ্কার। স্থানটি শহরের বাইরে। এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় পথে কাদা জমে গিয়েছিল। কাদা পার হয়ে একটা অর্দ্ধবাজারের মত স্থানে বাংগালীটির দেখা পেলাম। লোকটি তখন কতকগুলি তেলেভাজা খাদ্য বিক্রি করছিল। লোকটির বাড়ি হ'ল শ্রীহট্ট জেলায় এবং সে কোনও এক সময়ে খালাসীর কাজ করত। সে কি করে এদেশে আসে তার কথা জানতে চেয়েছিলাম। লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে বলেছিল "সে অনেক দিনের কথা"। যদিও লোকটি অনেক দিন হল স্বদেশ পরিত্যাগ করে বিদেশে বাস করছিল

এবং সেজন্য সে বার বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল তবুও আমার মনে হচ্ছিল লোকটি সুখী।

সে আমাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে গেল। এদিকে লোকের বসতি নাই। শুধু সেই-ই থাকে। তার ঘরখানা সমুদ্র হতে একটু দূরে। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলি অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং একাদশীতে ঘরের দরজা পর্যন্ত আসে। এদিকে বান ডাকে না, সেজন্যই কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। তার ঘরখানা একতলা এবং চারকোণা। ঘরের ভেতর তিনখানি রুম এবং প্রত্যেকটিই রুম সজ্জিত। ঘরের দেওয়ালে কোনরূপ ছবি ছিল না, তবে বড় বড় কয়েকটা মাছের কাঁটা ঝুলান ছিল। ঘরখানা শান্তিপূর্ণ এবং পরিষ্কার। প্রত্যেকটি রুমে একটি করে লোহার খাটিয়া এবং তার উপর জাজিম্ দিয়ে বিছানা করা ছিল। তার একটি গৃহরক্ষিণী ছিল। আমাদের যাওয়া মাত্র গৃহরক্ষিণী উনুনের কাছে তিনখানা কম্‌ফর্ট চেয়ার এনে দিল। সে নিজে একখানা চেয়ারে বসে আমাকে বলল "তুমি কি কিছু খাবে?" খেতে আমার আপত্তি ছিল না। গৃহরক্ষিণী তিন পেয়ালা কাফি এবং কতকটা মিষ্টি এনে দিল। মিষ্টি এবং কাফি খাবার সময় লোকটির পাকঘরের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, এঘরে সবই আছে। অথচ দেশী ভায়া পথে দাঁড়িয়ে মাছ এবং পাঁপড় ভাজা বিক্রি করছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যাকে গৃহরক্ষিণী বলে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল সে-ই প্রকৃতপক্ষে গৃহের রাণী আর ইনি হলেন চাকর।

নিগ্রো রমণী এত বুদ্ধিমতী হয় তা আমার ধারণা ছিল না। নিগ্রো রমণী প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল এবং অলস হয় এই ছিল আমার ধারণা; কিন্তু এ ঘরে এসে আমার মন একেবারে বদলে গেল।

দুঃখের বিষয় সিলেটি লোকটির নাম আমার ডাইরীতে লিখিনি তবে তারই আদেশে এবং উপদেশে এই নিগ্রো রমণী এতটুকু উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে দেখে মনে হল, যারা বলে ছোটলোক ছোটলোকই, বংশেরও একটা দাম আছে, তারা নিরেট মিথ্যাকথা বলে সমাজকে ঠকায়। মানুষকে বদলাতে অতি অল্প সময়ের দরকার হয়। কাল যে হিন্দু ছিল আজ সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে যা করে তাতেও এরূপ লোকের চোখ ফুটে না? এসব লোকই সহানুভূতি পায় উন্নতিবিরোধী সাম্রাজ্য-বাদীদের কাছ থেকে। সিলেটি ভায়ার ঘরখানা দেখে মনে হল এখানেই থেকে যাই, কিন্তু সে আশা পরিত্যাগ করে উঠবার সময় সিলেটি ভায়া আমাকে সামান্য লবংগমধু খেতে দিল। মধু খাওয়ার পর বলে দিল যদি এতে গরম বোধ হয় তবে যেন লেবুর রস খাই।

আমার শরীর দুর্বল ছিল। লবংগ-মধু আমার শরীরে শক্তি এনে দিল। আমি ক্রমাগত লবংগ-মধু খেতে লাগলাম। কয়েক দিন লবংগ-মধু খাবার পরই বুঝতে পারলাম এটাই হল আসল মৃতসঞ্জীবনী। একজন গুজরাতীর সাহায্যে দু-বোতল লবংগ-মধু কিনে নিয়ে আমার পিঠ-ঝোলাতে পুরে রাখলাম ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে বলে।

সিলেটি লোকটির কাছ থেকে দুটি জিনিস পেয়েছিলাম। প্রথমটি হল লবংগ-মধু, দ্বিতীয়টি হল কি করে অল্প উপার্জনে ভাল করে থাকা যায়।

# দ্বার-এ-সেলাম

জান্‌জিবারে দেখার মত আর কিছু ছিল না তাই কয়েক দিন বিশ্রাম করে টাংগানিয়াকা এলাকাতে যাবার জন্য একখানা জাহাজের টিকিট কিনলাম। এখান হতে টাংগানিয়াকার রাজধানী দ্বার-এ-সেলামে সপ্তাহে দুবার করে জাহাজ যাওয়া-আসা করে। বিদায়ের পূর্বে ইচ্ছা হল একবার জান্‌জিবারের আমদানী এবং রপ্তানী শুল্ক কেমন আদায় হয় তা জেনে যাই। জানতে পেলাম বিদেশ হতে আমদানী দ্রব্যের উপর প্রচুর টেক্স বসান হয়। বম্বে হতেই বেশীর ভাগ খাদ্যদ্রব্য জান্‌জিবারে যায়। বম্বের রপ্তানী টেক্স এবং জান্‌জিবারের আমদানী-কর দেবার পর ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য উঁচু দরে জান্‌জিবারে বিক্রয় হয়। ভারতবাসী তাদের স্বদেশের ডাল এবং চাল না হলে বিদেশে গিয়েও যেন বাঁচতে পারে না, সেজন্য উঁচু দরের মাশুল দিয়েও স্বদেশজাত উৎপন্ন দ্রব্যই ব্যবহার করে। বর্তমানে আফ্রিকাতেও নানা রকমের ডালের চাষ হচ্ছে; কিন্তু সে ডাল ভারতবাসী ব্যবহার করতে পারে না। তার একমাত্র কারণ হ'ল সে ডালে একটা বুনো গন্ধ থেকেই যায়। ভারতবাসী স্বদেশজাত উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করতে বাধ্য হয় বলে জান্‌জিবার সরকার তাদের প্রতি একটুও দয়া প্রকাশ করে না। ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর উঁচু হারে টেক্স বসিয়ে প্রত্যেক বৎসরে বেশ মোটা টাকাই রোজগার করে থাকে।

জান্‌জিবার হতে বিদায়ের দিন আমার গচ্ছিত এক শত শিলিং কাষ্টম আপিস হতে ফিরে পেলাম এবং যথানিয়মে আমার "পিঠ-

ঝোলাটি পরীক্ষা করিয়ে ছোট জাহাজে গিয়ে বসলাম। আমার পিঠ ঝোলাতে বেশী কিছু ছিল না। পিঠ-ঝোলাতে সাইকেল মেরামতের যন্ত্র, আফ্রিকার মানচিত্র, অটোগ্রাফ বই, এবং সামান্য কাপড় ছিল। তাই পরীক্ষা করতে এক জন কাষ্টম অফিসারের প্রায় আধ ঘণ্টা লেগেছিল।

জাহাজ ছেড়ে দেবার পর চারিদিকের দৃশ্য দেখে সময় কাটাতে লাগলাম। কয়েকজন আরব যাত্রীও ছিলেন। তাঁরা ইরাক, সিরিয়া এবং মস্কত হয়ে এসে এ দেশের ভ্রমণ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁরাও এক ধরণের পর্যটক। তাঁরা এসেছিলেন ব্যবসায়ের সংবাদ নেবার জন্য, আর আমি জান্‌জিবারে গিয়েছিলাম নিছক বেড়াবার জন্যই। ব্যবসায়ীরাই হ'ল রাজনীতির চাঁই। তাদের সুবিধা এবং অসুবিধার উপরই নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তি এবং অশান্তি। দুঃখের বিষয় এঁরা সকলেই পরাধীন দেশের বাসিন্দা, অতএব তাঁদের আমার ভয় করার মত কিছুই ছিল না। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভারতের শুভানুধ্যায়ী, এতে তাঁদের সংগে কথা বলতে আরও ভাল লেগেছিল।

আরব ব্যবসায়ীগণ আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি আমার কোন্ ধর্ম্ম, নিজেই বলেছিলাম আমি মুসলমান নই, মুসলমান ভেবে যদি আমার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় তবে তাঁদের সহানুভূতির কোন মূল্য থাকবে না। আমার কথা শুনে একজন ভদ্রলোক একটু দমখিচে আমাকে তাঁর কাছে বসিয়ে বললেন—"সে অনেক কথা, আমরা বেশ ভাল করেই জানি আপনি মুসলমান নন, যদি বুঝতাম আপনি ভারতীয় মুসলমান তবে মুখ খুলতাম না। আমরা হিন্দুস্থানেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। হিন্দুস্থানের মুসলিম হিন্দিরাই আমাদের আদর-যত্ন করেছিল, অন্যান্য হিন্দিরা আমাদের খোঁজখবরও নেয়নি। সেজন্য আমরা দুঃখিত হওয়া দূরের

কথা বরং সুখীই হয়েছিলাম। বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'অন্যান্য' হিন্দি বলতে বলতে আপনারা কি বুঝেন ? তারা বল্লেন "আমরা যখনই অন্যান্য হিন্দি বলি তখন বুঝবেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিন্দি। জহরলাল একজন 'বুদ্ধিস্ট,' তা নয় কি ? আমিও ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, তাই।

ভারতের অন্যান্য হিন্দিরা আরব ব্যবসায়ীদের অভ্যর্থনা করেনি শুনে আমার দুঃখ হয়েছিল। ভাবছিলাম দার-এ-সেলাম গিয়ে এ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে স্বদেশের কোন সংবাদপত্রে পাঠাব কিন্তু তা হতে বিরত হয়েছিলাম, কারণ আমাদের দেশের পর্যটকের কথার এখনও কোন মূল্য নাই। যে সময়ে পর্যটকের কথার দাম হবে তখনকার পর্যটকদের উপর এ সব খুঁটিনাটি কথা লেখার ভার রইল।

যথাসময়ে জাহাজ দার-এ-সেলামে এসে উপস্থিত হ'ল। জাহাজখানা যখন ডকের দিকে চলছিল তখন দেখলাম একখানা জাহাজ ডুবে রয়েছে। সংবাদ নিয়ে জানলাম এ জাহাজ জার্মানদের ছিল এবং গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ রণপোত জাহাজখানাকে ঘায়েল করেছিল। ঘায়েল করা নিমজ্জিত জাহাজকে এরূপ অবস্থায় ফেলে রাখার দরকার ছিল না। এই জাহাজ এক দিকে যেমন বৃটিশের রণবিজয়ের চিহ্ন বজায় রাখছিল অন্য দিকে তেমনি জার্মান জাতের মাঝে এক নব চেতনা এনে দিচ্ছিল যার প্রভাবে জার্মান জাত নতুন উদ্যমে গড়ে উঠছিল।

আমাদের ছোট জাহাজখানা যখন ডকে ভিড়ল তখন দেখতে পেলাম একখানা জার্মান মালবাহী জাহাজ স্বস্তিক পতাকা তুলিয়ে প্রবল বেগে রোষভরে বন্দর পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। একই সংগে দুটি দৃশ্য দেখে অনেকেই নানা কথা ভাবছিল—আমি কিন্তু সে দৃশ্যটিকে সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করছিলাম। আমার কাছে জার্মান

এবং বৃটিশ উভয়ই সাম্রাজ্যবাদী। নদীর তীর যেমন করে এক দিক ভাংগে এবং অন্য দিক গড়ে সাম্রাজ্যবাদীদেরও ভাংগা এবং গড়াই হল গতানুগতিক। নিগ্রোদের এই ভাংগা-গড়াতে বড় বেশি এসে যাচ্ছিল না। তার দৃষ্টান্ত বেশী দেরী করে খুঁজে বের করতে হয়নি।

জাহাজ ডকে ভিড়বার পরই নেবে পড়লাম এবং যে দিকে হিন্দুদের ধরমশালা ছিল সেদিকে গেলাম। ধরমশালা বের করতে বেশি সময় লাগল না। ধরমশালায় পৌছেই তার সুন্দর বারান্দার কাছে সাইকেলখানা দাঁড় করিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে বসলাম এবং ধরমশালায় থাকতে পারি তার ব্যবস্থা যাতে হয় সে কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। বেশিক্ষণ বসতে হ'ল না, একজন গুজরাতী ভদ্রলোক আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমার পরিচয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ একটি রুম দেখিয়ে দিলেন। রুমটি বড়ই সুন্দর। দুতলাতেই স্নানের ব্যবস্থাও ছিল। স্নান করে নিকটস্থ হোটেলে গিয়ে খাবার খেলাম এবং সে দিনই কতকগুলি যুবকের সংগে পরিচয় করলাম।

আমরা যাদের অসৎ ছেলে বলি, যারা চরিত্র দোষ আছে বলে সমাজের কাছে অপদস্থ হয়, এই যুবকগণ সেই শ্রেণীর লোক। লেখা-পড়ার দিক দিয়েও তারা বেশী আগিয়ে যায় নি তবে যে কোন সভাসমিতি হোক এরাই আগিয়ে আসে এবং কাজটি নিখুঁত ভাবে সমাপ্ত করে। অথচ এদের কেউ ভালবাসে না, এদের নামে নানারূপ বদনাম করা হয়, এমন কি দ্বার-এ-সেলামে যাঁরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁরাও অনেক সময় এদের একটু হিসাব করে চলেন। এরূপ ছেলেদের সংস্পর্শে প্রথম দিনই এসে পড়ায় আমাকে একটু বেগ সামলাতে হয়েছিল। এরা হ'ল মার্কা-মারা ছেলে। এই দুষ্ট ছেলেদের সংগে পরিচয় হবার পরদিনই তারা

একটা সভা করল এবং তাদের কয়টি দুঃখের কথা আমাকে জানিয়ে তাদের কি করতে হবে তারা উপদেশ চাইল।

জার্মান রাজত্বের সময় দার-এ-সেলামের নিগ্রোরা রাতেও চলাফেরা করতে পারত কিন্তু চুরি করত না, এমন কি যদি কেউ মানিব্যাগ পথে ফেলে যেত তাও চুরি করত না, বর্তমানে কিন্তু অবস্থার সমূহ পরিবর্তন হয়েছে। রাত্রে নিগ্রোরা শহরে থাকতে পারে না সত্য কথা কিন্তু দিনের বেলা উৎশৃঙ্খল ভাবে শহরে চলাফেরা করে এবং সুযোগ পেলে শহরের উপকণ্ঠে অত্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ইণ্ডিয়ানরা জাতি হিসাবে শক্তের ভক্ত, নরমের প্রতি গরম এটা প্রায়ই দেখা যায়। যতদিন নিগ্রোদের উপর জার্ম্মান প্রভাব ছিল ততদিন নিগ্রোরা মাথা নত করেই থাকত। জার্ম্মান প্রভাব চলে যাবার পর বৃটিশ প্রভাব পতিত হয়েছে। লোক আইনকানুন বেশ ভাল করে বুঝতে আরম্ভ করেছে। কোর্টে লোকের ভিড় হতে আরম্ভ হয়েছে। এদিকে যারা আইনের মার-পেঁচ খাটিয়ে দু'পয়সা অর্জ্জন করতেন এবং আইন দেখিয়ে যাদের চোখ রাংগাতেন সেই আইনের কোথায় [illegible]ক আছে তা অনেক নিগ্রো বুঝতে পেরে ছোটখাটো অত্যাচার করতে ভয় পাচ্ছে না। শান্তি-প্রিয় ভারতবাসী সেই অত্যাচার অবাধে সহ্য করে যাচ্ছে। এরই প্রতিশোধরূপে ভারতবাসীরা "পিয়োর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" করেছে। এতে বর্ণসঙ্করদের স্থান দেওয়া হয় না।

সভাতে সকল কথা শুনে আমার মতামত আরও দু'দিন পরে দেব জানিয়ে সেদিনই টাংগানিয়াকা অপিনিয়নের সম্পাদকের সংগে সাক্ষাৎ করলাম। ভদ্রলোক একজন বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তিনি পূর্বজন্মের কর্মফল বিশ্বাস করেন এবং বর্তমানে এখানে ভারতবাসীর দুর্দশার কারণ তাদের পূর্বজন্মের পাপের ফলেই হয়েছে তাই বলে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে

বিদায় করেছিলেন। নিগ্রোদের দ্বারা যারা অপমানিত হচ্ছিল তাদের সকলেই ইস্‌মাইলশ্রেণীর মুসলমান। ইস্‌মাইল শ্রেণীর মুসলমানরা বড়ই ধর্মপরায়ণ। হিন্দুরা কুলগুরুর পা-ধোয়া জল খেয়ে অনেকে স্বর্গে যাবার টিকিট কিনে এরাও তেমনি আঁগাখানের স্নানের জল কলসে এবং লোটায় ভর্তি করে রাখে। বিপদে-আপদে সেই জল একটু আধটু পান করে, গংগা নদীর জলের মত ঘরে-বাইরে ছিটা দেয়। এক জন হিন্দু এম্‌ এস্‌সি-র গংগাজলে যেমন অগাধ বিশ্বাস অর্থাৎ গংগাজলে পোকা হয় না বলে ধারণা আছে ঠিক তেমনি আঁগাখানের স্নানের জলেও পোকা হয় না বলেই তাদের ধারণা। এ হেন লোকই নিগ্রো দ্বারা নানা ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল।

পরের দিন আমার পূর্বপরিচিত ইব্রাহিমের সন্ধানে বের হলাম। অতি কষ্টে তাকে খুঁজে বের করলাম। সে দাঁড়িয়ে দেখছিল হজরত মহম্মদের জন্মদিন কি ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে। তার সংগে সাক্ষাৎ করেই আসল কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল এরূপ অত্যাচার সহ্য করতে হবেই। এই দেখুন না, আমি একজন সিয়া, আমার কাছে এসব দৃশ্য ভাল লাগছে না, হিন্দুদের সংগে প্রভেদ ত লেগেই আছে। আমার ধর্ম নিয়ে যতটুকু বাজে কথা বকতে পারি অন্য কিছুতে সে ভাবে মন দেই না। ১৯৩৮ সালই বোধ হয় হবে কারণ ইব্রাহিম বলেছিল গতবার যখন আঁগাখান এখানে এসেছিলেন তখন তাঁকে ওজন করে, সেই ওজন অনুযায়ী স্বর্ণ দেওয়া হয়। যে যত বেশী চাঁদা দিয়েছিল তাকে আঁগাখান তত বড় পদবী দিয়েছিলেন। যারা পদবী পেয়েছিল তার মাঝে একজন ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করে চাঁদা দেয়। মোকদ্দমা তখনও চলছিল। আমাদের ধর্ম অর্জনের একমাত্র পথ হ'ল টাকা, সেই টাকা অর্জন করতে যদি আমাদের মান-ইজ্জত যায়ও তাতে ক্ষতি কি? আমরা যে মরলে

পরে স্বর্গে যাব সে কথা কি আপনি জানেন না ? বিষয়টা বেশ ভাল করেই বুঝলাম এবং পরের দিন এই দুর্দান্ত "চরিত্রহীনদের" বলেছিলাম, যদি ভারতবাসীর মান-ইজ্জত বজায় রাখতে চাও তবে রাজদ্বারে ধন্না দিয়ে কোন লাভ হবে না। তোমাদের মা-বোনদের তোমাদেরই রক্ষা করতে হবে, সে মা-বোন যে কোন ধর্মের লোকই হউক। আমার উপদেশ মতে এরা কাজ করেছিল কি না জানি না তবে শহরে আমার উপদেশের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ ব্যাঁরিষ্টার ঘোষ সেরূপ উপদেশই যুবকদের দিতেন।

তিন চার দিন অতিবাহিত হবার পর টাংগানিয়াক স্ট্যাণ্ডার্ড বলে একখানা স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের সংগে পথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি একজন বেঁটে এবং পেট-মোটা বৃটন। কথায় এবং চালচলনে মনে হ'ল লোকটি জাতে ইংলিশ। ইংলিশরাই জার্নালিজম বেশি পছন্দ করে। পথে দেখা হবার পর তিনি আমাকে তাঁর আপিসে যেতে বল্লেন। একই সংগে আপিসে গিয়ে বাইরে বারান্দায় উভয়ে মিলে বসে নানা বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম তিনি পৃথিবীর সংবাদ বেশ ভাল করেই রাখেন। তাঁর কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে তিনি আমাকে বিদায় দেবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করলেন—

আপনি সংবাদ বেচেন্ ?

না মহাশয়।

আপনি যদি সংবাদ বেচ্তেন তবে আমি যে সংবাদ আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি সেজন্য দুই গিনি দিতে পারতাম।

সংবাদ বিক্রি করি না একবার বলে ফেলেছি। কথা বদলানটা বড়ই খারাপ দেখে দুঃখিত মনে যখন ফিরে আসছিলাম তখন সম্পাদক

ফের আমাকে ডেকে বললেন "আপনার সম্বন্ধে বেশ একটি ভাল প্রবন্ধ কাল সকলে আমার কাগজে দেখতে পাবেন।" আমি দূর থেকেই বললাম "সেজন্য আমাকে ধন্যবাদ।" পরের দিন সংবাদপত্রে দেড় কলম ব্যাপিয়া আমার সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ বের হল। প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য তবে তাতে এমন কিছু ছিল না যা দেখে আমি হাত তুলে নাচতে পারতাম। কিন্তু প্রবন্ধটি বের হবার পরই হঠাৎ কোথা হতে কয়েকটি লোক এসে পড়ল। তার মাঝে এক জন নিজভাষাভাষী লোকও ছিলেন। তাদের উচ্চ প্রশংসা শুনে আমি হয়রান হয়েছিলাম। মনে মনে ভাবলাম বৃটন লোকটি আমাকে ভাল বলেছে তাই বৃটনের পদলেহনকারীরা আমারও পদলেহন করতে আসছে। একজন ভদ্রলোক যখন বললেন "টাংগানিরাকাস্ট্যাণ্ডার্ড শুধু আপনারই প্রশংসা করেছে, অন্য কোন ভারতবাসীর এত প্রশংসা আজ পর্যন্ত করে নি।" তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম এরূপ প্রশংসার কোন মূল্য নাই, মহানুভাবগণ, এই প্রশংসার পেছনে মস্তবড় একটা আদেশও রয়েছে তা আপনারা দেখেছেন কি? সেই আদেশ কিরূপ সংবাদপত্রের সম্পাদক করেছেন তা বুঝবার জন্য চেষ্টা করুন। বাংগালী মহাশয় আর মুখ বন্ধ রাখতে পারলেন না, তিনি মুখ খুলেই বললেন "তা কি আমরা জানি না, নিশ্চয়ই জানি, আবার এটাও জানি আপনি এই অদৃশ্য আদেশ মানবেন।" ভদ্রমহাশয় স্বভাষাভাষীকে বলতে বাধ্য হলাম "ক্লাইভ এবং পাঠানরা যখন বাংলা দেশে এসেছিল তখন আপনাদের মত মহানুভাবগণই আপনাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা স্থাপিত "দোল-দুর্গোৎসব" বজায় রাখতে গিয়ে পাঠানরাজ্য এবং বৃটিশ রাজ্য স্থাপন করতে সাহায্য করেছিলেন, আমি সে চিজ নই। আমি তথাকথিত সম্মানের ধার ধারি না, আমি

পথের লোক, অতএব আদেশ এবং উপদেশেরও কোন তোয়াক্কা রাখি না। এখন বিদায় মহাশয়গণ, এবার আসুন।

সাধারণত বাংগালী বড়ই প্রভুভক্ত এবং নিমকহালালকারী। তাদের দ্বারা প্রভুর আদেশ ষোলআনা স্থলে সতের আনাই আদায় হয়। এ যে হতেই হয়। প্রভুকে সন্তুষ্ট না করলে, ঘরে গিন্নীর স্বর্ণবলয় হবে না, মেয়ের বিয়ের পণ জুটবে না, বাপ-ঠাকুরদার আমলের দোল-দুর্গোৎসব চলবে না, অতএব বাংগালী প্রভুর সেবা করে পেটকাওয়াস্তে। এরূপ দেহি পদপল্লবমুদারম্ বাংগালীর দর্শন বিদেশে পেয়ে একটু দুঃখিত হলাম বই কি! তারপর গল্পেরও হদ্দ নাই। ওই বাঘ আসল, ঐ সিংহ আসছে। কখন বা গাছের উপর চড়ে, কখন বা পিস্তল দিয়ে আর কখন বা সারডিন্ খোলার ছুড়ি দিয়ে বাঘ, ভালুক, সিংহ, গণ্ডার হত্যা হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রমহাশয় জানেন নি সুন্দরবন হতে ব্যাঘ্র চালান আফ্রিকাতে হয়নি অথবা ঐ শ্রেণীর বাংগালীর গুরুদেব ওয়ারেন্ হেস্টিংস এদেশ থেকে যাবার সময় পোর্ট সৈয়দে একটি বাঘের বাচ্চা ছেড়েও দেয়নি। বুঝলাম দ্বার-এ-সেলামের বাসিন্দারা অন্ধকারের আফ্রিকার আঁধার কত ঘোলাটে তারই সন্ধান রাখে। এর বেশি নয়।

শহরে জীবন বেশ আরামেই কাটছিল কিন্তু হঠাৎ কতকগুলি যুবকের ইচ্ছা হ'ল আমাকে নিয়ে একটু জংগলে বেড়িয়ে আসে। আমি তাদের কথায় রাজি হলাম এবং সকাল বেলা তাদের নিয়ে জংগলের দিকে রওনা হলাম। যতক্ষণ সাইকেল যায় ততক্ষণ যুবকগণ আমার আগে আগেই চলতে লাগল। তারপর এল নিগ্রো গ্রাম। নিগ্রো গ্রামগুলি বড়ই সুন্দর। চারিদিকে নারিকেল, মাচুংগা (ওরেন্‌জ), আম, কাঁঠাল, বাতাবী এবং অন্যান্য ফলবৃক্ষে পরিশোভিত।

ওরেন্‌জ এবং কমলালেবু একই জাতীয় ফল নয়। আফ্রিকার, অস্ট্রেলিয়ার, কানাডার এবং আমেরিকার ওরেন্‌জ একই জাতীয়। মহাত্মা গান্ধী যে কমলালেবুর রস দিয়ে উপবাস ভংগ করেছেন তাও সেই জাতীয় ফল, অথচ বাংলা দেশের সংবাদপত্রের অনুবাদকগণ লিখেছেন "মহাত্মা গান্ধী এক গ্লাস কমলালেবুর রস দিয়ে উপবাস ভংগ করেছেন।" সিলেটের অথবা নাগপুরের কমলালেবুর ইংলিশ শব্দ আজ পর্যন্ত তৈরি হয় নি। সেজন্য ওরেন্‌জ শব্দটিকে বাংলা ভাষায় আমি অনুবাদ না করেই ওরেন্‌জ শব্দই ব্যবহার করলাম। নিগ্রোরা ওরেন্‌জকে বলে "মাচুংগা। এসব ফল-পুষ্পে পরিশোভিত গ্রামগুলি ছাড়িয়ে যখন বাস্তবিকই বনে প্রবেশ করতে হল তখন যুবকগণ আসল পেছনে আর আমি চল্লাম আগে।

কয়েক মাইল চলার পরই পাহাড় আরম্ভ হল। পাহাড়ের গায়ে ঠিক ঠিক ভাবেই বন ছিল এবং তার ভেতর দিয়ে চলাও বেশ কষ্টকর ছিল। বনে সাপ এবং চিতা বাঘ ছাড়া অন্য কোন হিংস্র জীবের ভয় ছিল না, তাই আমি আমার সাথীদের সংগে করে নিশ্চিন্ত মনেই আগিয়ে চললাম। কতক্ষণ যাবার পর আর একটা নিগ্রো বাড়ী পথে এল। লোকটা একেবারে গভীর জংগলে বাস করে। তার ঘরের কাছে কোথাও ফলবৃক্ষ ছিল না। ছেলেরা নিগ্রো লোকটার কাছ হতে একটি সংবাদ সংগ্রহ করল। নিগ্রো বলেছিল আরও আধ মাইল যাবার পর জংগলী ওরেন্‌জ বাগান দেখতে পাব। আমরা নিগ্রো লোকটির নির্দেশমত আগিয়ে গিয়ে এক প্রকাণ্ড ওরেন্‌জ বাগান দেখতে পেলাম। বাগানে অনেক ওরেন্‌জ-বৃক্ষ ফলভরে নত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেরা উন্মত্ত হয়ে জংলী ওরেন্‌জ আহরণ করতে লাগল। আমি সে দৃশ্য অনেকক্ষণ বসে দেখলাম। তারপর বনে কি কি জাতীয় বৃক্ষ হয় তার

একটা লিষ্ট করে নিয়ে যুবকদের জিজ্ঞাসা করলাম তারা আরও আগিয়ে যাবে কি না? কেউ আগিয়ে যেতে রাজি হল না। যুবকগণ বন দেখে ভয় খেয়ে গিয়েছিল। ভয় হবার কথাই, কারণ শহরবাসী ছেলে এই প্রথম বনে আসছে।

দার-এ-সেলামে অনেক ধনী ভারতবাসীর বাস। ঐ ভারতবাসীদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। গুজরাতী, পান্‌জাবী এবং হিন্দুস্থানী; গুজরাতীদেরই সংখ্যা শতকরা নব্বই জন আর বাকি দশ হ'ল পান্‌জাবী এবং হিন্দুস্থানী। গুজরাতীদের মাঝে নানা শাখা আছে যেমন বেনে, ইস্‌নেসেরী, খোজা, ইস্‌মাইলী খোজা, সুন্নি, বোরা এবং অন্যান্য। বিদেশে এসেও এরা নিজেদের ছোট খাটো প্রভেদ ভুলতে সক্ষম হয় নি। চোখের সামনে দেখছে আরব ভারতীয় মুসলমানকে অবহেলা করছে এমন কি পারলে অবমাননা করছে তবুও ওদের মাঝে আরবপ্রেম লেগেই আছে। হিন্দুরা কিন্তু এ হিসেবে অনেক উপরে গিয়েছে।

স্থানীয় নিগ্রোরা এখনও ধর্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেয় না. সেজন্যই বোধ হয় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে তারা এত তাড়াতাড়ি জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। নিগ্রো, আরব, গ্রীক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাত ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ক্রমেই এমন একটি মনোভাব গড়ে তুলছে যার ফলে এদেশেও ভারতবাসীর ভবিষ্যতে টেকা কষ্টকর হবে। সুখের বিষয় এখানে কতকগুলি ভারতবাসী একটা 'কমন ফ্রন্ট' তৈরি করেছে। তারা সদ্য ভারতবর্ষ হতে আগত। এদের অনুগ্রহে যদি ভারতবাসী মত এবং পথ বদলিয়ে বসবাস করে তবেই ভারতবাসী টাংগানিয়াকা এলাকায় বাস করতে পারবে, নতুবা শুধু পদাঘাতে ভারতবাসী বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

টাংগানিয়াকার ভারতবাসী রক্ষণশীল। তারা ভাবে বৃটিশের দালালী করেই চিরদিন সুখে থাকবে। বৃটিশের দালালী সকল দেশে সকল সময় চলে না—একথাটা ধনী ভারতবাসীরা অনেক ঠেলা-ধাক্কা খাবার পরও বুঝতে সক্ষম হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এখন বুঝতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু সময়ে বুঝতে সক্ষম হয় নি। ভারতবাসী যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন বর্জননীতি ভয়ানক রুক্ষভাবে তার কাজকর্মে ফুটে ওঠে। বিশুদ্ধ ভারতবাসী সংঘ বলে যে একটি প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে তাতে ফল এমনি দাঁড়াবে যে নিগ্রো রমণীর দিকে জাত ভারতবাসীর ছেলেরা ভারতবাসীর মাথা কাটতে বড়ই আনন্দ অনুভব করবে। কারণ সেখানে ধর্মের গোলামী এখনও প্রকট হয়ে দাঁড়ায় নি, এখন লোকের মনে দাস্যভাবও ভাল করে জাগে নি। আমার স্মরণ আছে, একটি দশ বৎসরের নিগ্রো রমণীর ছেলে আমার কাছে এসে বলেছিল "তার বাবা একজন ভারতীয় মুসলমান, মা তার নিগ্রো, কিন্তু ভারতীয় বিদ্যালয়ে তার প্রবেশ নিষেধ, এ কাজটা কি ভারতবাসীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়েছে? আমি তাকে বলেছিলাম "এটা ভয়ানক অন্যায় কাজ হয়েছে।" সে আমার হাতে ধরে বলেছিল "আমাদের সংখ্যা বাড়ছে, যেদিন আমাদের সংখ্যা দুই শত হবে সেদিন খাঁটি ভারতবাসী বুঝবে আমরা কি পদার্থ।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তোমরা কি করবে?" উত্তরে বলেছিল "যেমন করেই হউক ভারতবাসীদের আমরা এদেশ হতে তাড়াব, এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকবে।" কথা শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছিলাম কিন্তু যেরূপ ভাবে সংবাদ পাচ্ছিলাম তাতে মনে হয় এই শ্রেণীর লোকই ভারতের শত্রুতা করছে সকল রকমে। এরূপ শত্রুতা করবেই না কেন? ইউরোপীয়ানরা তাদের ছেলেমেয়েকে অন্তত একটা স্কুল করে দিয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে কিছু করে খেতে পারে, কিন্তু ভারত-

বাসী তাদের নিগ্রো স্ত্রীর ছেলেমেয়েদের পথে বের করে দিতে পারলেই যেন বাঁচে। নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা অনুভব করে। হিন্দুরা অতি কমই নিগ্রো স্ত্রীলোক বিয়ে করে। যে সকল হিন্দু নিগ্রো স্ত্রী বিয়ে করেছেন তাঁরা তাদের ছেলেমেয়েদের পরিত্যাগ করা দূরের কথা, যাতে তাদের উন্নতি হয় তারই চেষ্টা করছেন, কিন্তু অন্যান্যরা তা না করে ভবিষ্যতে ভারতবাসীর বিপদের সৃষ্টি করছে।

মৃত্যুর পূর্বে জেনারেল ক্রগার বলেছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকাতে ভারত-বাসীর যদি স্থান হয় তবে তাঁর আত্মা কষ্ট পাবে। বড় দুঃখে তিনি সেকথা বলেছিলেন। তাঁর সেরূপ মন্তব্য করার অধিকার ছিল বলেই বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমি ভারতবাসী, আমি বলব ভারতবাসী অনেক বৎসর ধরে নানা রকমে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার জন্যই স্বদেশে বিদেশে নানারূপ অন্যায় কাজ করেছে এবং এখনও করছে—এসব দোষ ক্ষমার উপযুক্ত। দক্ষিণ-আফ্রিকা যখন ঠিক ঠিক ভাবে স্বাধীন হবে তখনই তারা আমার অন্তরের কথা বুঝবে।

দারে-এ-সেলামে আসার পর তারু আমার সংগে দেখা করেছিল। সে আমাকে বলেছিল এখান হতে জাহাজে চড়ে গোল্ডকোস্টে যাবে। সেখান যেতে যদি সম্ভব হয় তবে পরে আমেরিকা যাবার চেষ্টা করবে। আমেরিকায় যেতে না পারলে দক্ষিণ-আফ্রিকাতে বান্টুদের সংগে মিশে যাতে করে দক্ষিণ-আফ্রিকাতে নিগ্রোদের উন্নতি হয় তারই চেষ্টা করবে। তার মন ছিল সরল এবং কঠিন। সে হয়ত একদিন কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে এবং আফ্রিকা হতে সকল রকমের সাম্রাজ্যবাদ নিপাত করতে সক্ষম হবে। আমার সংগদোষে অথবা সংগ গুণেই হক তার জীবনের গতি পরিবর্তন হয়েছিল। উগান্ডা এবং বাগান্ডা শ্রেণীর লোকের কাছে দাঁড়িয়ে লেকচার দেবার সময় তার

চোখ হতে যেন অগ্নিস্ফুলিংগ বের হত। তাকে অন্যান্য নিগ্রোদের মত দেখাত না। তার মুখ সকল সময়ই গম্ভীর থাকত এবং বই পড়বার সময় এমন তন্ময় হয়ে যেত যে কাছে বসে যদি কেউ কোন বাজনা বাজাত তবেও তার মনের গতি বদলাতে পারত না। তারুকে বিদায় দিয়ে দার-এ-সেলামে আর থাকতে ভাল লাগল না তাই দার-এ-সেলাম পরিত্যাগ করে আগিয়ে যাওয়াই ভাল মনে করলাম। এখন তারুর কথা ভেবে আনন্দ পাই কারণ তারু একদম বদলে গিয়েছিল। সকল ধর্মের সেরা বস্তু মরণের পর স্বর্গবাস তার মন হতে লোপ পেয়েছিল। তারই পরিবর্তে গড়ে উঠেছিল বাস্তব প্রার্থীর মান ইজ্জতের প্রবল বাসনা। জাতের মংগলই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার একমাত্র কামনা।

তারু আমাকে বিদায়ের পূর্বে বলেছিল, মরণ এক দিন হবেই। মরবার পূর্বে নিগ্রোজাতের কিছুটা উন্নতি করে যেতে হবেই। মত এবং পথ নানা রকমের হতে পারে কিন্তু উন্নতি হওয়া চাইই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম নিগ্রোদের কিরূপ উন্নতি চাও?

তারু হেসে বলছিল অনেক মাস আপনার সংগে আমি থেকেছি, এবং বুঝতে পেরেছি নিগ্রোদের অনেকেই মানুষ বলে স্বীকারই করতে রাজি নয়। যখন কোনও নিগ্রো বন্য জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং লোকটি বন্য জন্তু দ্বারা নিহত হয়ে পথের পাশে পড়ে থাকে তখন বিদেশী দর্শক বন্যজন্তু এবং নিগ্রোদের একই পর্যায়ে ফেলে নিগ্রোদের কথা ভুলেই যায়। তারা ভাবে একটা বাঘ একটা হরিণ মেরে খেয়েছে তাতে এল আর গেল কি? এরূপই যাদের চিন্তাধারা তাদের কাছ থেকে ধর্ম-উপদেশ শুনে নূতন নূতন ধর্ম গ্রহণ করা মূর্খামী হবে। বৈদেশীক লোকের ভেতর থেকে আরও জ্ঞান অর্জন করা সময়ের অপব্যবহার হবে। আপনার কাছ থেকে যা শিখেছি তাই যদি কাজে লাগাতে পারি তবেই অনেক কাজ করতে সক্ষম

হব। বানা এবার বিদায়, আমার বিদ্রোহী মন দীর্ঘজীবি হক। এই কথা কটি বলেই তারু আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

দ্বার-এ-সেলাম শহরে এসে কতকগুলি ভারতবাসীর সংগে সাক্ষাৎ হয়, তাঁদের কাজকর্ম এবং চালচলন দেখে বুঝেছিলাম তাঁরা নামের প্রত্যাশী মোটেই নন। সেজন্য আমিও তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করলাম না। যাঁরা কাজ করে তাঁরা বাস্তবিকই সর্বসাধারণের প্রীতির ভাজন হয়। নাম তাঁদের কাছে আপনিই আসে। তাঁদের অমায়িক ভাব এবং সর্বসাধারণের সাহায্যের জন্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করতে দেখে আমার মনেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁদেরই আদেশে ডুডুমা (Dodוma) নামক স্থান পর্যন্ত রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করি। ডুডুমা হতে টাবোরা ( Tobora ) পর্যন্ত রেলগাড়ীতে না গিয়ে সাইকেলে গিয়েছিলাম। দ্বার-এ-সেলাম হতে ডুডুমা পর্যন্ত ভ্রমণকালে এমন কিছু ঘটেনি যা আমি পাঠকের কাছে বলে পাঠককে একটু আনন্দ দিতে পারি। রেলগাড়িতে চলার পথে আমি ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেদিন একটিও ভারতীয় নারী যাত্রী ছিলেন না, অতএব রস সাহিত্যের অবতারণা এখানে করা চলে না। তৃতীয় শ্রেণীতে চাটাই এর উপর বসে যে সকল নিগ্রোরমণী ভ্রমণ করছিলেন তাঁদের নিয়ে টানা-হেঁচকা করা আমার মত দরিদ্র পর্যটকের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অতএব এই ভ্রমণ-পথটুকুর সংবাদ একেবারেই কিছু বলতে পারলাম না। সারাটি পথ ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

ডুডুমা পৌঁছেছিলাম রাত বারটায়। শহরের লোকজন তখন সকলেই ঘুমাতে ছিল। আমার সংগে যে কয়জন ভারতীয় যাত্রী গাড়ি হতে নামল তারা কেউ গেল নিজেদের ঘরে আর কেউ চল্ল শিখদের গুরুদ্বারে। আমিও তাদের সংগে চল্লাম। শহরের বুকের উপর দিয়ে

সে পথ চলেছে। রাত যদিও অন্ধকার তবুও পথের উপর কাঁচ প্রস্তুত করার উপযুক্ত পাথরের গুঁড়া থাকায় পথের উপরের পুন্‌জীভূত অন্ধকাররাশিকে পথ যেন ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল। পথ চলার সময় আমি সেই পাথরের গুণগরিমার কথাই ভাবছিলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই শহরের বাইরে অবস্থিত একটা পুরাতন টিনের ঘরের কাছে এসে দেখলাম ঘরে আলো নাই, ঘর অন্ধকার এবং তার সামনের দরজাটা খোলা। টিপবাতির সাহায্যে ঘরের ভেতরটা একটু দেখে নিলাম। দেখলাম ঘরের ভেতর কয়েকজন লোক শুয়ে আছে আর অভ্যাসবশে ঘুমের মধ্যেই মশা তাড়াচ্ছে। ঘরে মানুষ আছে দেখে আমার মনে বেশ সাহস হল এবং সেই ঘরটাতে রাত কাটাব বলে স্থির করলাম। সংগের অন্য দু তিন জন লোক ঘরের অবস্থা দেখে শহরে ফিরে যাওয়াই পছন্দ করল। আমি তাদের সংগ নিলাম না, কারণ তারাও আমাকে তাদের সংগে যাবার জন্য ডাকেনি। আমি ভাবছিলাম মাথা গুঁজবার স্থান যা পেয়েছি তা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নয়। সংগের লোকগুলি চলে গেলে ঘরের বারান্দায় বসেই একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। ঘরটা ছিল দুতলা। উপরের তলায় এক জন শিখ শুয়ে ছিল। আমরা চার জন লোক এসেছিলাম, ঘরে প্রবেশ করে নানারূপ কথাও বলেছিলাম। এতে উপর তলায় নিদ্রিত লোকটার ঘুম ভাংগে নি, কিন্তু যেই আমি দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিলাম অমনি তার ঘুম ভেংগে গিয়েছিল এবং চীৎকার করে বলেছিল, "এখানে সিগারেট খাওয়া নিষেধ।"

'আমি লোকটার কথার জবাব না দিয়ে বাইরে গিয়ে টিপবাতির সাহায্যে ময়দানটা দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘরের পেছনেই এক রকমের জীব একটা হাড় চিবাচ্ছে। ঐ শ্রেণীর জীবকে আমরা "খাটাস"

বলি এবং প্রবাদ রয়েছে যেখানে বাঘ যায় এই দুষ্ট জীবও তার পেছনে চলে। আফ্রিকাতে বাঘ নাই, চিতাবাঘ আছে, বোধ হয় চিতা বাঘের পেছনেই এই জীবটি চলছিল। আমি জীবটাকে বিরক্ত না করে ঘরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু মশার এতই উপদ্রব ছিল যে এরূপ স্থানে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব ছিল। আমার সংগে মশারি ছিল কিন্তু মশারি খাটাবার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় চুপচাপ করে বসে না থেকে ফের ময়দানে বের হয়ে গেলাম। টিপবাতি আমার হাতেই ছিল কিন্তু সে বাতি জ্বালাই নি। কারণ আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ টিপবাতির আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছিল আর নিবছিল। লক্ষ লক্ষ জোনাকী পোকা দিগন্তব্যাপী প্রজ্জ্বলিত হয়ে ময়দানে অন্ধকার রাতকেও বেশ আলো করেছিল। সেই আলোতে লক্ষ লক্ষ হিংস্র জীব পালে পালে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কেউ পালাচ্ছিল আব কেউ পলাতক জীবের পেছন নিচ্ছিল। সেই দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর ছিল।

যখন কোন বন-গরু অথবা হরিণের পালের উপর হিংস্র জীব লাফিয়ে পড়ছিল তখনই তারা প্রাণভয়ে পলায়ন করছিল। সেই পলায়মান জীবের চলা-ফেরাটা যেন সাগরের জলের তরংগের মত মনে হচ্ছিল। বলেছি ময়দানের মাঝে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ময়দান সমতল ভূমি নয়, উঁচুনীচু। উঁচুনীচুতে রাতে যখন বন্যজীব পালে পালে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে তখন সাগর-জলের তরংগের মতই দেখায়। সে দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখলাম, হঠাৎ মনে হল এরূপ স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভাল নয়, বিপদ আসতে কতক্ষণ? মশায় ভরা ঘরটাতেই ফিরে এলাম। দুঃখের সহিত বলছি, যে বন্য জীবের ভয়ে ঘরে চলে এসেছিলাম সেই বন্যজীবের আশেপাশে আমাকে

এর পরে রাত কাটাতে হয়েছিল। ঘরে এসে বসেই বাকি রাতটুকু কাটিয়ে সুন্দর সুপ্রভাতে ডুডুমা শহরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

ডুডুমা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। উত্তর দিক হতে প্রকাণ্ড একটি মোটা পথ শহরে প্রবেশ করে এঁকে-বেঁকে ফের দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। এই পথটার নাম হল কেপ্ কাইরো রোড। পূর্ব হতে আর একটা বড় পথ এসে শহরে প্রবেশ করে ফের পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। এই পথটাও কম নয়, ভারত মহাসাগর হতে শুরু হয়ে আতলান্তিক মহাসাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এতে শহরের গুরুত্ব বেড়ে উঠেছে। ডুডুমা শহর মোটেই বড় নয়। লোকসংখ্যা হাজার পাঁচেকের বেশি হবে বলে মনে হল না। এই শহরের সবচেয়ে যে বড় দোকান তার মালিক হলেন এক জন সিন্ধি। সকালবেলা উঠেই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন বেশ অমায়িক লোক, তাই একটু খাবার খেতে দিয়েই স্থানীয় ধরমশালায় আমাকে পাঠিয়ে দেন। হিন্দুসভার সেক্রেটারী ছিলেন সেই গৃহের রক্ষাকর্তা। স্থানীয় ধরমশালা বেশ সুন্দর স্থান। সুন্দর স্থানে থাকতে পারব ভেবে মনটা হঠাৎ খুলে গেল, মনে হল ভবিষ্যৎ পৃথিবীর এক প্রসিদ্ধ স্থানে এসেছি। এর চারি দিক ভাল করে দেখতে হবে। এখানকার জল, এখানকার মানুষ, এখানকার মাটি সবই পরীক্ষা করা দরকার। তাই ধরমশালাতে বেশিক্ষণ না বসে, ছোট্ট শহরটির চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কয়েকবারই উত্তরের পথটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—কাইরো হতে কোনও মোটরকার কেপ টাউনের দিকে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরূপ একখানা মোটরের দেখা পেলাম না। প্রত্যেক দিনই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পথটার দিকেই চেয়ে থাকতাম আর কত কিছু ভাবতাম.তার পর ফিরে আসতাম।

যদিও সিদ্ধি লোকটি অমায়িক, যদিও তাঁর দোকান সজীব ভাবেই সজ্জিত ছিল তবুও মনে হল সেই সজীবতায় লাবণ্য নাই। অদূরে এক বেণের দোকান। বেণে কাঠিওয়ার-নিবাসী। বেণে বয়সে বৃদ্ধ। তাঁর দোকানে পূর্বদেশীয় ভাব বিরাজমান। বেণে একটি ইংলিশ কথাও জানেন না, তবুও তাঁর কথায় এমনই একটি প্রখরতা ছিল যা আমাকে তাঁরই কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি কখনও পূর্বদেশীয় প্রথা পছন্দ করিনি, পূর্বদেশীয় পোষাক আমার কাছে মোটেই ভাল লাগত না, কিন্তু এই বৃদ্ধ আমাকে অতি অল্প সময়ের মাঝে তাঁর কাছে টেনে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বৃদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সংগেই দক্ষিণ আফ্রিকাতে সত্যাগ্রহ করে ভীষণ-ভাবে নির্যাতিত হন। এখন এই বৃদ্ধ আর সত্যাগ্রহের পক্ষপাতী নন, এখন বৃদ্ধ কার্যত এক জন গুণ্ডা। বৃদ্ধ নিরামিষভোজী। তিনি আমাকে বলছিলেন অনেক জৈন ধর্ম্মাবলম্বী আছে তারা একটি জীবও বধ করে না, কিন্তু যখন তারা নরহত্যায় অগ্রসর হয় তখন তারা চেংগীজ খানের মত দয়ামায়াহীন হয়ে নরহত্যা করে। যদিও এই বৃদ্ধ নরহত্যা করেন নি তবুও তাঁর "ধুতি প্রসাদ" নাম চলে গিয়ে "ধুতি প্রমাদ" নাম হয়েছিল। বৃদ্ধ আমাকে তাঁর ঘরে স্থান দিতে সমর্থ হননি বলে বড়ই দুঃখিত ছিলেন, কিন্তু খাবারের বন্দোবস্ত করেছিলেন।

তাঁর ঘরের একদিকে নানারূপ দেবদেবীর মূর্তি ছিল। প্রত্যহ তাদের পূজা হচ্ছিল আর সেই ঘরেরই অপর দিকে টেবিল চেয়ারে বসে খাবারের বন্দোবস্তও ছিল। বেণে বৈষ্ণব; তাঁর জাতবিচার ছিল না। একই টেবিলে মুসলমানের সংগে খেয়ে একই স্থানে হাত মুখ ধুয়ে, পুরাতন সনাতনীদের পদাঘাত করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখছিল।

# অরণ্যে

ডুডুমা হতে কিছু দূর গেলেই আরম্ভ হয় সুন্দর সবুজ ঘাসযুক্ত ময়দান। সে স্থানে নানারূপ বন্য জীব আরামে বিচরণ করে। সেই বন্যজীব দেখবার প্রবৃত্তি আমার লোপ পেয়েছিল। এখানে নতুন প্রবৃত্তি জেগে উঠল। বৃদ্ধের কাছে দেশ-বিদেশের কথা শোনা, বিপদে কি করে আত্মরক্ষা করা যায় তার উপায় জেনে নেওয়া, কি করে বিপদে স্থির থাকা যায় সেরূপ মনোভাব অর্জন করা—এসব কথাই আলোচনা করতাম বেশি। বৃদ্ধ বলতেন, "যদি মন ঠিক করে রিক্ত হস্তেও কাউকে আক্রমণ করা যায় তবে তার আর রক্ষা থাকে না।" তিনি নাকি মারামারির সময় প্রায়ই শত্রুকে রিক্ত হাতে আক্রমণ করে শত্রুর অস্ত্র দিয়ে শত্রুকেই আঘাত করতেন। ১৯১৭ সালে যখন জার্মানরা ডুডুমা ছেড়ে চলে যায় তখন নিগ্রোরা তাঁর দোকান আক্রমণ করেছিল। তিনি একাই অনেক নিগ্রোকে কাত করতে সক্ষম হন। সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ তাঁকে সোনার মেডেল দেয়নি, বরং তাঁর আচরণে অনেক অফিসার প্রকাশ্যেই রাগ দেখিয়েছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি একদা সত্যাগ্রহ করেছিলেন। সত্যাগ্রহী শুধু লাথিই খাবে, লাথি যদি ফিরিয়ে দেয় তবে আর তাহার সত্যাগ্রহী গুণ থাকে না, সে হয় রাজদ্রোহী।

বৃদ্ধ আমাকে ডুডুমা হতে বিদায়ের দিন বলেছিলেন "জংগলের জানোয়ার যদি দেখতে চাও তবে ঐ দুটি লোককে সংগে নিয়ে যাও, তারা তোমাকে সাহায্য করবে, আর তাদের ঐ ক্ষুদ্র সাহয্যের বদলে তুমি এক নয়া দুনিয়া দেখবে।" আমি নিগ্রো দুটিকে সংগে নিতে রাজি হলাম। তারা যুবতী নয়, যুবক। তারা শ্বেতকায় নয়, নিগ্রো। তারা ভীরু নয়, সাহসী। তারা একদিন ছিল সেপাই, এখন তারা

সিভিলিয়ানও নয়, এখন তারা নিগ্রো। আফ্রিকার নিগ্রো। যাদের অপর নাম কাঁফের। তারা যখন এক স্থান হতে অপর স্থানে যায় সেই গমনা-গমনকে বলা হয় "সাফারী"। অনেক ইউরোপীয় পর্যটক এই নিগ্রোদের কাঁধে চড়ে অনেক সাফারী করেছেন, অনেক আরব এই নিগ্রোদের রক্তে নিজেদের ছোরা লালে লাল করেছে, কিন্তু নিগ্রোরা এখনও বেঁচে আছে, তারা বেঁচে থাকবে, তারা হয়ত একদিন মানুষও হবে।

ডুডুমা হতে টাবোরা পর্যন্ত সুন্দর সমতল ভূমি। এই ভূমিখণ্ডকে পাড়ি দিতে হলে অনেক খাদ্য সংগে করে নিয়ে যেতে হবে। পথে গ্রাম পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে সিংহের বিচরণ-ভূমি। এমন বিপদসংকুল স্থান দিয়ে চলা উচিত হবে কি না তাই অনেকক্ষণ ভেবে বৃদ্ধের কথায় রাজি হলাম এবং যারা সাথী হবে তাদের খাদ্যের বন্দোবস্ত করার জন্য বল্লাম। তাদের হাতে চল্লিশ শিলিং দিয়ে বল্লাম তোমাদের ইচ্ছামত খাবার কিনে আন। তারা তাদের ইচ্ছামত চাল, আটা, নুন নিয়ে এল এবং পরের দিন বৃদ্ধকে সংগে নিয়েই শহরের বাইরে গেলাম। বৃদ্ধ আমাকে বিদায় দিয়ে বললেন, এ জংগলে অনেক কিছু শেখার আছে, তার পরই বৃদ্ধ চলে গেলেন। আমিও সাথীদের হাঁটতে আদেশ দিয়ে সাইকেলে বসে এগিয়ে চললাম।

কতক্ষণ যাবার পরই পথটা হঠাৎ চিক্কণ হয়ে গেল। একখানা মোটর যাতে চলে যেতে পারে সেরূপ প্রশস্ততা নিয়েই পথটি আগিয়ে চলল। পথে দেখার মত অনেক কিছুই ছিল। রকম-রকমের হরিণ অতি কাছেই আপন মনে ঘাস খাচ্ছিল। বন-গরু আমাদের দেখে একটু দূরে গিয়ে ফের ঘাসে মুখ দিচ্ছিল। উটপাখী তাদের সংখ্যাও অনেকই ছিল। উটপাখী নাকি মরুভূমিতে থাকে কিন্তু এটা ত মরুভূমি নয়, এটা একটি সুন্দর তৃণভূমি। তৃণভূমিতে উটপাখী

রাজহাঁসের মত ঠোকর দিয়ে কি উঠাচ্ছিল এবং সূর্যের পানে চেয়ে তাই গিলছিল। আমি অনেকক্ষণ সেই দৃশ্যই দেখছিলাম। দিনে একটি হিংস্র জীবের দেখা মিলেনি বলে মোটেই দুঃখিত হই নি বরং আনন্দিতই হয়েছিলাম।

ভয় বড়ই মারাত্মক। ভয়কে বড় করে তোলে ভীতু এবং কাপুরুষ। কাপুরুষের সংখ্যা পৃথিবীতে অনেক। যারা টাকার উপর বসে থাকে তারা ভয়-উৎপাদনকারী গল্প বলতে বড়ই ভালবাসে। ধনীরা বিপদসংকুল স্থানে যায় না। যদি তাদের বিপদসংকুল স্থানে যেতে হয় তবে তারা নিজে না গিয়ে অন্য লোক পাঠিয়ে কাজ সম্পন্ন করে। এর মাঝেই যদি কাপুরুষদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকত তবে মানবসমাজের বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। ধনীদের নানারূপ এজেন্ট আছে। সংবাদপত্রে যারা লেখে, বই লিখে যারা জীবনধারণ করে তাদের মাঝেও অনেক ধনীদের-এজেন্টি করে বেশ দুপয়সা অর্জন করে। তারা ধনীদের মনের মত অনেক গল্প লিখে আর টাকা রোজগার করে। কিন্তু তারা জানে না এরূপ গল্পের দ্বারা নরসমাজের কত ক্ষতি হয়। আমিও আফ্রিকা সম্বন্ধে কয়েকখানা গল্পের বই পড়েছি। আজ সেই গল্পের বইগুলির কথা সজীব হয়ে আমার চোখে ভাসতে লাগল। মরণভয় এসে দেখা দিল। পথ চলতে আমার ইচ্ছা হল না। আমার বসে থাকতে ইচ্ছা হল। পথ বেশ ভাল অথচ আমি চলতে পারছিলাম না। ভয় আমাকে কাবু করে ফেলেছিল।

অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম—এটা কি সত্যিকারের ভয়? না, এটা সত্যিকারের ভয় নয়, এটা হ'ল টাকার ভয়।

আমার হাতে এক শত পাউণ্ডের মত জমা হয়েছিল। যদি

আমার টাকা হারিয়ে যায়, যদি আমকে জানোয়ারে মেরে ফেলে তবে আমার আর ভ্রমণ হবে না, যে কারণে লোক আমাকে টাকা দিয়েছে তার কোনই ফল হবে না, এই ভয়েই আমি ভীত ছিলাম আর বইপড়া গল্পগুলি তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। আমি টাকার গোলাম নই এটা ছিল আমার অহংকার। আজ আমার সে অহংকার খর্ব হতে বসেছে দেখে বড়ই দুঃখিত হলাম। উঠে দাঁড়ালাম। নিগ্রোদের ডাকলাম। তারা আমার কাছে এল। পকেট থেকে বের করে প্রত্যেকের হাতে নোটগুলি ভাগ করে দিলাম। গুণেও দেখলাম না তাতে কত আছে। টাকাগুলি তাদের হাতে দিয়ে বললাম গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেন টাকাগুলি আমাকে ফিরিয়ে দেয়। নিগ্রোরা আমার হাতের টাকাগুলি তাদের হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ তা দেখল। গণল ভাল করে। পকেটে রাখল যত্ন করে, তার পর আবার চলতে লাগল।

এবার আমি স্বাধীন। টাকা বড় বালাই। টাকা আমাকে এত নীচে টেনে এনেছিল। এবার আমার মরণ ভয় নাই। এবার আমার মন খুলে গেছে। এবার আমার বেশ আনন্দ হয়েছে। এবার আমার চোখও খুলে গেছে। আমি টাকার মোহে অন্ধ হয়েছিলাম, এবার আমার বুদ্ধি এবং চোখ দুটা ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করছে। টাকাগুলি হাতে পেয়ে নিগ্রো দুজন আনমনা হয়ে পথে হাঁটছিল। এবার টাকারোগে তাদের পেয়ে বসেছে। টাকারোগ বড়ই কষ্টদায়ক। শরীরে জ্বর হয় না অথচ শরীরের উত্তাপ বেড়ে যায়। ভয়ের কোন কারণ নাই অথচ ভয় করে। শরীরে দুর্বলতা নাই অথচ শরীরটা যেন অবশ হয়ে যায়। মিথ্যা বলার কোন দরকার নাই অথচ মুখ হতে অনবরতই মিথ্যা কথাই

বের হয়। টাকারোগ এবার সাথী দুজন নিগ্রোকেই পেয়েছে। এতে আমার ভাল হল। এদের যা বলছি তাই শুনছে। কি করে আমাকে সন্তুষ্ট করবে তারই উপায় খুঁজছে। কয়েক দিনের জন্য আমি একজন বড়লোক হয়েছি বললেও অত্যুক্তি হয় না। টাকায় মানুষকে বড়লোক করে না, এই সত্যটা এই প্রথম জানলাম।

এসব কথাও অনেকক্ষণ ভাবছিলাম তার পর মনে হল এমনি করেই ধনীর দল শিক্ষিত দরিদ্রদের খাটায়। এবার চোখের পাতা অন্যদিকে ঘুরল। হঠাৎ দৃষ্টি গেল দূর্বা দিকে। কি সুন্দর লম্বা দূর্বা ঘাস। ডগাগুলি বেশ মোটা। একটু চিবিয়ে দেখলাম খেতে বেশ মিষ্টি। যদি দূর্বা ঘাস আরও একটু রসাক্ত হত তবে নিশ্চয়ই নরভোজ্যে পরিণত হ'ত। এরূপ সুন্দর সুখাদ্য তৃণভোজীরা পরিত্যাগ করতে পারে না বলেই এখানে আসে এবং তাদের শত্রুর দ্বারা রাত্রে আক্রান্ত হয়। মহিষ এখানে একটাও নাই। আফ্রিকার হাতী এবং মহিষ মানুষের শত্রু। সিংহ, চিতাবাঘ, ছোট বাঘ, শৃগাল জাতীয় ছোট নেকড়ে—এরা কদাচিৎ মানুষকে আক্রমণ করে। লোকে আফ্রিকার মোটা এবং লম্বা সাপের কথা বলে, তাদের কথা যে সত্যিই ঠিক তার দৃষ্টান্ত তারা সিনেমায় দেখে, কিন্তু এসব সাপ যে আফ্রিকায় হয় না সে সংবাদ কেউ রাখে না। আফ্রিকা বড়ই বিপদের দেশ এ কথাটাই লোকে জানে, এর বেশি নয়। কিন্তু বৃটিশ, ফ্রেন্চ, পর্তুগীজ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের দিন ফুরিয়ে আসছে। তাদের কথা আর কেউ বিশ্বাস করবে না। এমন সুন্দর দেশের এমন বদনামের কোন মূল্যই নাই। টাবোরা হতে ডুডুমা পর্যন্ত হবে সুন্দর শস্য ক্ষেত্র। এ ভূমিকে কেউ পতিত

করে রাখতে সমর্থ হবে না। হয়ত এরূপ আইনের অস্তিত্ব থাকবে কি না তার কথা অতি সত্বরই ঠিক হবে।

যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর এই সুখময় ভূমি দেখে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। বিকালে একটি জলাভূমির কাছে আমরা থাকবার বন্দোবস্ত করলাম। আমাদের সংগে তাঁবু ছিল না। আমার মশারিটাই তাঁবু করে নিয়ে বিশ্রাম করলাম। সন্ধ্যার সময় মশার উপদ্রব ছিল না। বড় করে আগুন প্রজ্জলিত করা হল না। কাফে, মাংস এবং রুটির বন্দোবস্ত হল। কয়েকটা পেঁয়াজ এবং আলুও সিদ্ধ হল। সিগারেট আমাদের সংগে ছিল। এবার খাবার খেয়ে ঘুমালেই হল। কিন্তু ঘুমালাম না। সাথী নিগ্রোদের সংগে তাদের সামাজিক নিয়ম-কানুনের কথা নিয়েই আলোচনা করতে লাগলাম।

এই নিগ্রোদ্বয় শিক্ষিত। আফ্রিকার ইতিহাস, ভূগোল এবং পৃথিবীর প্রায় সংবাদই এরা রাখে, তবে এরা নিগ্রো বলেই এদের জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। যে জ্ঞান পেলেও ব্যবহারে লাগান যায় না সে জ্ঞানের কোন মূল্য থাকে না। জ্ঞানের ব্যবহার করতে হয়। এতে যদি কেউ বাদ সাধে তবে তার সংগে বাদ সাধতে হয়। আমার সংগীদ্বয় ভাগ্যে বিশ্বাসী।

এদের সংগে কথা বলে জানলাম, নিগ্রোদের এখনও মানবিক বৃত্তিগুলি ঠিক ঠিক বিকশিত হয় নি। বর্বর যুগে মানুষ প্রকৃতির সংগে লড়াই করার জন্যই তার মনের বিকাশ হয়েছিল কিন্তু নিগ্রোরা সে সুবিধা মোটেই পায় নি। তারা বর্বর যুগ কাকে বলে তা ধারণাও করতে পারে না। এরই মাঝে তারা বিনা কষ্টে মাটির ঘর, অক্ষর, নানারূপ খাদ্য এবং পরিধেয় পেয়ে গেছে। তাদের এখন একটি জিনিষ পেতে হবে, সেটি হল রক্তের বিনিময়। এইটিই যাতে করে তাদের

না হয় সেজন্য এংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করছে। জার্মান, ভারতের ইণ্ডো-এরিয়ান এবং ইউরোপের স্কেণ্ডিনেভিয়ানরা এংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করছে।

ইচ্ছা করলেই আফ্রিকার নিগ্রোরা তাদের মা-বোনকে বিদেশীর হাত হতে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু সেটি তারা করে না। যে কারণে নিগ্রোরা এ বিষয়ে কোনও প্রতিবন্ধক জন্মায় না, সেই কারণটি ভারতের সর্বত্র একদা প্রচলিত ছিল, নতুবা একই পরিবারে রংবেরংএর লোক বর্তমানে দেখ্‌তে পাওয়া যেত না। নিগ্রোরা পুরাতন ভারতীয় প্রথা অবলম্বন করেছে মাত্র। এরপরও আফ্রিকাতে একটি আইন আছে। সেই আইনটি হ'ল যদি কোন ইউরোপীয়ান অথবা এশিয়াটিক কোনও বিবাহিত নিগ্রো স্ত্রীলোককে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে পুনরায় বিয়ে করে অথবা ঘরে চাকরাণী ক'রে রাখে তবে সেই নিগ্রো স্ত্রীলোকটির স্বামী কোর্টে গিয়ে কোনয় সহায়তা লাভ করতে পারবে না। বিদেশী লোকটিই নিগ্রো-স্ত্রীলোকটির মালিক হয়। তা বলে কোনও এশিয়াটিক অথবা ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোককে নিগ্রোরা যদি কোনও প্রকারের অসম্মান করে তবে সেই নিগ্রোর কঠোর শাস্তি হয়। নিগ্রোদের অ-নিগ্রো স্ত্রীলোক বিবাহ করা প্রশ্নের মাঝেই আসে না।

এই আইনটি টাংগানিয়াকা এলাকা যখন জার্মানরা শাসন করত তখন প্রবর্তিত হয়েছিল। সুদক্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন টাংগানিয়াকা এলাকা তাদের ম্যানডেট করে নিল তখন 'দুষ্ট' জার্মানদের 'নিকৃষ্ট' আইনটি 'শিষ্ট' ভাবেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা গ্রহণ করল।

বৃটিশের নিয়ম হল, পুরাতনকে বজায় রেখে নতুনের জন্ম না

হতে দেওয়া। টাংগানিয়াকা এলাকায়ও সে ব্যবস্থা হয়েছিল। যে সকল ভারতবাসী ইউরোপীয়দের সমতা লাভ করতে চায় তাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি তারা কেন তাদের নিগ্রো স্ত্রীদিগের ছেলেমেয়েকে সমাজে নেয় না? উত্তরে তারা বলে "তবে কি তাদের জাত থাকবে"?

আমি তখন বলতাম, "যেদিন নিগ্রোদের তোমাদের সমাজে স্থান হবে সেদিন ইউরোপীয়ানরাও তোমাদের সম্মান দেবে"। আমার কথা শুনে অনেকেই আমার প্রতি রাগ দেখাত, এতে আমি একটুও চিন্তিত হতাম না। আমার সংগীদের কাছে এই ধরণের কথা বলেই অনেক রাত কাটিয়ে দিলাম, তারপর একটুও চিন্তা না করে তিনজন একই মশারিতে শুয়ে পড়লাম। পরদিন যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন দেখলাম আমাদের কারো কোনও ক্ষতি হয় নি, আমাদের সুনিদ্রাই হয়েছিল এবং শরীরও সুস্থ ছিল। আফ্রিকার জংগল তোমাকে নমস্কার আর যারা তোমার সম্বন্ধে কুকথা বলে দু'পয়সা উপার্জন করছে তাদেরও "ধন্যবাদ"।

আমাদের ভ্রমণ একই রকমের ছিল। দৃশ্যও একই রকমের। তিন দিন চলার পর পথ চলতে আর ভাল লাগল না। জংলি গরু, হরিণ, নানারূপ তৃণভোজী জীব—এদের এক দিনই দেখতে ভাল লাগে, তারপর একঘয়ে হয়ে যায়। সেজন্য স্থির করলাম একটি জংলী গরুর বাছুরকে ধরব আর গাইটা যদি বাছুরের মায়ায় আসে তবে তাকে দুইয়ে কিছু দুধের ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমার মনে ছিল না এসব হল জংলী গরু। জংগলে জংলী জীব পরাধীন নয়। তারা মরতে রাজি তবুও পোষ মানতে রাজি নয়। আমরা প্রাণপণ করেও একটা গরুকে ধরতে সমর্থ হলাম না। ঘোড়ার

সাহায্যে এই জানোয়ারকে ধরতে পারা যায়। শুনেছি জংলী গরু নাকি পোষ মানে না।

সেদিন বেশি চলতে পারলাম না। তার পরের দিন আমরা একটি ছোট গ্রামে উপস্থিত হলাম। গ্রামে নিগ্রো ছিল না, সকলেই ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান। ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যাও বেশি নয়। যে কয় ঘর জার্মান গ্রামে বাস করত তারাও ইণ্ডিয়ানদের হতে বেশি দূরেই থাকত। ইণ্ডিয়ানদের সংগে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বললেও চলে। বর্ণবিদ্বেষ জার্মানদের মাঝেও প্রচুর ছিল। তবে তারা ডিপ্লমেসী করত না। সোজা কথায় জানিয়ে দিত ইণ্ডিয়ানরা তাদের সমকক্ষ কোনমতেই নয় এবং সেইজন্যই তারা ইণ্ডিয়ানদের তাদের হোটেলে স্থান দেয় না। দিতে পারতও না।

ইউরোপের শিক্ষা অনেক উন্নত স্তরের এ কথাটা আমাদের মানতেই হবে। নাগরিক হবার উপযুক্ত জ্ঞান তাদের সকলেরই আছে অথচ আমাদের সেদিকে লক্ষ্যই নাই। আমরা যেখানে-সেখানে থুথু ফেলি। ফেজ মাথায় দিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করি না। ঘরের মেজেতে হাঁটবার সময় ধুপধাপ ক'রে চলি। জার্মানরা এসব মোটেই পছন্দ করে না, এবং সেজন্যই আমাদের তাদের কাছে ঘেঁসতে দেয় না। বৃটিশ হল শাসক, তাদের কথা না বললেও চলে। তবে বৃটিশ বড়ই ডিপ্লম্যাট। অনেক সময় বৃটিশরা বলে, "আমরা বর্ণ-বৈষম্য মোটেই পছন্দ করি না—জার্মানরা এই কুপ্রথা এদেশে প্রবর্তন করেছে, সেজন্যই আমরা মেনে চলতে বাধ্য।

গ্রামে এসে একটা ঘর ভাড়া করে তাতে প্রবেশ করলাম, কারণ এখন আমার পক্ষে নিগ্রো সাথীদের পরিত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সাথী নিগ্রোরা গরম জল করে আমাকে স্নান করতে

বলল। আমার স্নান হয়ে গেলে তারাও স্নান করল। তারা সভ্য জগতের প্রথামতে নেংটা হয়েই স্নান করল। নেংটা হয়ে স্নান করাটাকে আমি সভ্যতার একটা অংশ বলেছি। নেংটা হয়ে স্নান করতে হলে ঘরের ভেতরই স্নান করতে হয় এবং সেজন্য স্নানাগার বলে একটা কুঠরিও তৈরি করতে হয়। আমরা এত হাংগামায় যেতে চাই না বলেই গামছা পরে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের স্নান হয়ে গেলে প্রত্যেকে এক একখানা লুংগি জড়িয়ে বিছানায় বসলাম এবং একজন অপরের শরীর হতে ডুডু পোকা বের করে তা আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগল। আমার শরীর হতে সেদিন পনর হতে কুড়িটা ডুডু পোকা বের করা হয়েছিল। ডুডু পোকা নখের কাছেই সাধারণত হয়। ডুডু পোকা ধ্বংস করে, আবার গরম জলে হাত পা ধুয়ে তাতে পটাসিয়াম পারমাংগানেট বেশ গাঢ় করে গুলে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলাম। এতে অনেকক্ষণ হাত পায় জ্বালা করল কিন্তু তাতে উপকার হ'ল।

গ্রামের নাম কিলিমতিন্দি। গ্রামটা ছোট এবং সুন্দর। গ্রীক ধরণে গ্রামের অবস্থিতি। গ্রাম হতে দূরে নিগ্রোদের বাস। এ অংচলের নিগ্রোরা চুরি করে না। তারা বড়ই মিতব্যয়ী এবং অতিথি-পরায়ণ। দুঃখের বিষয় এখনও ভারতে নিগ্রো প্রথামতে অতিথিসেবা হয় না। অতিথির মত এবং পথের সন্ধান নেওয়া হয়। নিগ্রোরা সেরূপ কিছু জানতে চায় না।

আমরা ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে নিগ্রোদের গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হলাম, কারণ এখানকার ইণ্ডিয়ানরা একজন ভারতবাসীকে নিগ্রোদের সংগে থাকতে দেখতে চায় না। আমরা ঘরের ভাড়াও দিলাম না। নিগ্রো গ্রামে যাবার পর আমরা সুখেই

ছিলাম। দুধ, ঘি এবং কয়েকটি মোরগ আমাদের জন্য কেনা হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান গ্রাম হতে চাউল কিনিয়ে আনালাম। তার পর পাক আরম্ভ হল। পাক হয়ে গেলে তিন জনে একই সংগে বসলাম। নিগ্রোরা আমার চেয়ে বেশি খেতে পারল না। খাদ্যের সদ্ব্যবহার আমিই বেশি করলাম। খাবার শেষ হয়ে গেলে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেও স্থান ত্যাগ করা হল না। বিশ্রাম করাই ভাল মনে করলাম।

নিগ্রোদের শরীরে লোম খুব কমই হয়। কিলিমতিন্দি গ্রামে কয়েকজন লোক দেখলাম, তাদের শরীরে অনেক লোম ছিল। এমন কি অস্বাভাবিক বললেও দোষ হয় না। সাথীদের এ সম্বন্ধে একটু গবেষণা করতে বললাম। তারা শুধু জানিয়ে দিল বাঁদর-সংস্পর্শে এলেই এরূপ হয়। সাথীরা ভদ্র এবং পণ্ডিত, সেজন্যই এক কথায় তারা কথাটার জবাব দিয়ে দিল। আমার কিন্তু তাদের এক কথার জবাব মনে উঠল না। অথচ তাদের কাছে বেশি করে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলাও চলে না, সেজন্য সারাটা দিন গ্রামটাই ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু একটা বাঁদরও দেখতে পেলাম না।

রাত্রে সাথীদের জিজ্ঞাসা করলাম "বাঁদর সংস্পর্শে আসা" মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না। দয়া করে এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতেই হবে। আমার কথা শুনে উভয় নিগ্রোসাথীর চোখ কপালের দিকে উঠল। তাদের চিন্তাকুল অবস্থা দেখে আমিও কতক চিন্তিত হলাম এবং বললাম যদি ইচ্ছা না হয় তবে এ সম্বন্ধে কিছু না বললেও চলবে। বন্ধুগণ তবে এটা জেনে রেখো আমি এ সম্বন্ধে একটা কিছু কুল-কিনারা করবই। টাবোরা আমাদের পথে আসছে, সেখানে অনেক ইণ্ডিয়ানও আছে, তারা আমাকে এ সম্বন্ধে সকল কথাই

খুলে বলবে। আমাকে শুধু টাবোরা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। আমার কথা শুনে আমার সাথীদের একটু চৈতন্য হল। তারা বুঝল আমার কাছে কথা লুকিয়ে রাখলে কোন লাভ হবে না। তাই তারা অনিচ্ছায় কতকগুলি কথা বলে ফেলল। তারা যা বলেছিল এখানে আমি অতি সংক্ষেপে বলছি।

অনেক সময় নিগ্রো পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সিম্পান্‌জী দ্বারা অপহৃত হয়। স্ত্রীলোক প্রায়ই সিম্পান্‌জীর কবল হতে মুক্ত হয়ে আসে, পুরুষ আসতে পারে না। যে সকল স্ত্রীলোক সিম্পানজীর কবল হতে মুক্ত হয়ে আসে তাদের অনেকের সন্তান হয়। যে সকল লোকের শরীরে অনেক লোম এবং মুখাকৃতি বিকট তারাই হল সেই স্ত্রীলোকদের সন্তান। তারা বেশ কথা বলতে পারে, সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলে, বুদ্ধিও যে তাদের কম হয় তা মোটেই অনুভব হয় না। এদের কাছ থেকে এরূপ কথা আমি মোটেই প্রত্যাশা করিনি। ভাবছিলাম এদের কথা অন্তত যাচাই করে দেখব। কেহ কেহ কথাটা সত্য বলে স্বীকার করেন আর কেহবা হেসেই উড়িয়ে দেন।

সমতল ভূমি কয়েক দিনের মধ্যে পার হতে হবে ঠিক করে পরের দিনই গ্রাম ছেড়ে রওয়ানা দিলাম। তিন দিনে ছয়ষট্টি মাইল পথ চলে সিনা ( Shinyanga ) নামক স্থানে পৌঁছলাম। স্থানীয় লোক এই নয়টি অক্ষরকে একত্রিত করে সিনা উচ্চারণ করে। স্থানীয় লোকের চলতি উচ্চারণ আমিও লেখলাম। এখানে একটি রেল স্টেশন আছে। গ্রামে পৌঁছেই সর্বপ্রথম রেল স্টেশনে গেলাম। রেল স্টেশনে গিয়ে সংবাদপত্র কিনতে পেলাম না। ইংলিশ সংবাদ-পত্র নিগ্রোরা যাতে না কিনতে পারে সেজন্যই স্টেশনে সংবাদপত্র

বিক্রি হয় না। এ বিষয়ে কিন্তু সকলেই একমত। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, বৃটিশ এমন কি ভারতবাসীরা পর্যন্ত নিগ্রোদের শিক্ষিত দেখতে চায় না। সংবাদপত্র স্টেশনে না পেয়ে মনটা দমে গেল। তিন জনে ফের শহরের বাইরে নিগ্রোগ্রামে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। একখানা ঘর ভাড়া করে সর্বপ্রথম ঘরখানা পরিষ্কার করিয়ে বিছানা পাতলাম। তারপর নিগ্রোরা জল গরম করল। চা করা হলে তাই তৃপ্তির সহিত খেয়ে আমি বিশ্রাম করতে লাগলাম। নিগ্রোরা নিকটস্থ কুয়া হতে জল উঠিয়ে স্নান করল এবং ঘরে এসে আমার জন্য গরম জল করে দিল। গরম জলে স্নান করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আর নিগ্রোরা পাক করতে লেগে গেল। শরীরটা বেশ অসুস্থ অনুভব করতে লাগলাম।

মোয়ান্‌জা সন্নিকটে। তিন দিন পথ চললেই মোয়ান্‌জা পৌছতে পারব। এদিকে গরম একটু বেশী। ভিক্টোরিয়া হ্রদের দক্ষিণ তীরে মোয়ান্‌জা অবস্থিত। মোয়ান্‌জা নাকি একটা বড় শহর, সেখানে গিয়ে থাকাই ভাল মনে করলাম। পরের দিন সকাল বেলায় পুনরায় পথে আসলাম।

সিনা হতে মোয়ান্‌জা পর্যন্ত পথ নিরাপদ নয়। এদিকে বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু এবং অন্যান্য নিশাচর পশু মানুষকে প্রায়ই আক্রমণ করে। আমরাও মানুষ, অতএব এসব বন্য জীব হতে আমাদেরও রেহাই ছিল না। আমরা এখন-থেকে এক সংগেই চলতে লাগলাম। সাইকেল সংগে ছিল মাত্র কিন্তু বসতাম না। প্রত্যহ আমরা বাইশ মাইল করে চলতাম। পথের দুপাশে পাথরের পর্বতমালা। পাথরের পর্বতমালা সূর্যের আলোয় দুপুরবেলা তেতে উঠে এবং বড় পথ দিয়ে যারা চলে তাঁদের উপরই তেতালো পাহাড় হতে লু-এর মত একটা

বাতাস এসে শরীরে লাগে। অনেকে সে গরম সহ্য করতে পারে-না। আমি তা সহ্য করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এসব পথে রাত কাটানো নিরাপদ নয়। অজগর শ্রেণীর সাপের প্রথম ভয় তারপর বিচ্ছুও আছে। সেজন্য সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হ'ত। আগুন সকলেই ভয় করে। বিচ্ছুও আমাদের কাছে আসতে সাহস করল না। তিন দিন পথ চলে চতুর্থ দিন আমরা মোয়ান্‌জাতে আসি। আমি স্থানীয় হিন্দু ধরমশালায় স্থান পাই, আর আমার সাথীরা অন্যত্র গিয়ে বাস করতে থাকে। মোয়ান্‌জা পৌঁছার দুদিন পরই আমাকে পুনরায় ম্যালেরিয়া আক্রমণ করে। এখানে এক জন জার্মান ডাক্তার ছিলেন। তাঁকেই ডাকলাম। তিনি তিনটি মাত্র বড়ি দিলেন এবং বললেন এতেই জ্বর সেরে যাবে। বড়ি তিনটিকে এটাব্রিন বলা চলে না, কুইনাইনও নয়। তিনটি বড়িতেই আমি সেরে উঠেছিলাম, কিন্তু শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে এখানে সাতদিন থাকতে হয়েছিল।

এখানে প্রচুর গোদুগ্ধ পাওয়া যায়। আমি নিগ্রোদের সাহায্যে দুধ কিনিয়ে এনে প্রচুর পরিমাণে দুধ খেতে লাগলাম। মোয়ান্‌জাতে আসার পরই মনে হয়েছিল আমি স্বদেশের কোনও গ্রামে এসেছি। আমাদের দেশের গ্রামের গঠনের সংগে নিগ্রোদের ঘরবাড়ি তৈরি করার বেশ সম্বন্ধ আছে। আমরা এখনও প্রিমিটিভ অবস্থায় আছি তা বলার জন্য কথাটা উত্থাপন করছি না। যখনই মানুষ একদম বর্বর থাকে তখনই তারা ঘরগুলি গোল করে তৈরী করে। যেমন আমাদের দেশের শিবমন্দির। যখনই মানুষ একটু সভ্য হয় তখনই সে দোচালা ঘর তৈরী করে। শীতপ্রধান দেশে লোক যখন বর্বর ছিল তখন একচালা ঘরই বোধ হয় গঠন করেছিল। তারপর যখন আরও উন্নতি করে তখন তাদের ঘরের চালের সংখ্যাও বাড়ে। নিগ্রোরা দুচালায় এসেছে মাত্র।

শহর থেকে বের হয়ে বিকালবেলা গ্রামে যেতাম এবং নিগ্রোদের ক্রম-বিকাশ দেখতাম আর সন্ধ্যার পূর্বে ধরমশালায় ফিরে আসতাম।

মোয়ান্জায় বার মাসই আম পাওয়া যায়। ডাক্তার আমাকে আম খেতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ এখানকার আম বড়ই টক। ডাক্তারের আদেশ কিন্তু আমি মানতাম না। সুপক্ক আম পেলেই একটু খেয়ে দেখতাম যে কেমন আম। বাস্তবিকই আমগুলি টক। তবে একটু চেষ্টা করলেই আমের উন্নতি হতে পারে। এখানে নানারূপ মাছ, মাংস, দুধ, চাল, ডাল সবই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে স্থানটি বাংগালীদের বাস করবার উপযুক্ত স্থান। মোয়ান্জায় ভারতীয় খোজাদের সংখ্যা বেশি। খোজা দু'রকমের। এক দল হল আগাখানী অন্য দল হল ইস্‌নেসেরী। উভয় দলের লোকই ভীতু। নিগ্রো, আরব এবং অর্দ্ধ আরবদের খোজারা বেশ ভয় করে। এখানে বেণেও আছে। তারা সাহসী এবং বেশ দাপটের সংগেই বাস করছে। কয়েকটি গ্রীক পরিবারের সংগেও আমার দেখা হয়। তাদের ভাষা যদিও গ্রীক তবুও এদের গ্রীক বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হত না। এদের আকৃতি নিগ্রোদের মতই। তবে এরা গ্রীক এবং ইংলিশ ছাড়া অন্য কোন ভাষা বলত না। দু-এক ঘর লোক হলে কি হয়, এদেরও বেশ সাহস আছে।

এখানকার ভারতীয় মুসলমানগণ ইসলাম অথবা মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না এবং ভবিষ্যতেও পরিচয় দেবে না। তার একমাত্র কারণ হল, এখানকার কতকগুলি নিগ্রো মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছে। ভারতীয় মুসলমানরা যদি মুসলমান বলে পরিচয় দেয় তবে পোলটেক্স হতে রেহাই পেতে পারবে, কিন্তু গাড়িতে নিগ্রোদের এক সংগে বসতে হবে, শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। এসব কথা ছেড়ে দিলেও আরবগণ নিগ্রোদের

আর একটা নাম নিয়েছে, সেই নামটা হ'ল "কাফির"। মুসলমান হয়ে "কাফির" বলে লোক সমাজে পরিচিত হওয়া বড়ই লজ্জাকর বিষয়। সেজন্য ভারতীয় মুসলমানরা এখানে হয় ইণ্ডিয়ান বলে পরিচিত নয়ত খোজা, বোরা, বেণে বলে নিজেকে অভিহিত করে।

কোনও এক সময়ে এখানে নাকি প্যান-ইস্লাম মোভমেণ্টের বেশ তোরজোর ছিল। আফ্রিকাতেও তার ধাক্কা এসে লাগে। তখনকার দিনের কয়েকটা লাইব্রেরী এখনও বর্তমান আছে এবং তখনকার দিনের কয়েকখানা সংবাদপত্র আজ পর্যন্ত (১৯৩৯ খৃঃ) বেঁচে আছে। এই সংবাদপত্রগুলির পাশেই দেখলাম স্টার অব ইণ্ডিয়াও স্থান নিয়েছে। অনেকেই চেষ্টা করে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের একটা ন্যাশনে পরিণত করতে কিন্তু পেরে উঠে না। আবার, তুরুক এবং ইরাণী এসব ছোটখাট বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রপেগেণ্ডায় নাচতে রাজি নয়। আরবগণ প্যান-ইসলামের এত বিরুদ্ধবাদী যে তারা ভুলেও এসব লাইব্রেরীতে আসে না এবং নিজেদেরও সকল সময় আরব বলে পরিচয় দেয়।

ছোট শহর মোয়ান্জাতে শরীর একটু ভাল হবামাত্র রেলগাড়ীতে করে টাবোরা আসি। এখানে থাকবার একটি বেশ ভাল স্থান পেয়েছিলাম। এখানের হিন্দুরা সকলে মিলে একটি ভারতীয় বিশ্রামাগার করেছে। বিল্ডিংটি বড়ই সুন্দর এবং থাকার সুবন্দোবস্ত সুচারু রূপেই করা হয়েছে। খাটিয়ার উপর জাজিম, বিছানার চাদর এবং বালিশ দেওয়া হয়। পাশেই একটি পাতকূয়া, তার জলও বেশ ভাল। ঘরখানা দেখার ভার একজন নিগ্রোকে দেওয়া হয়েছে। নিগ্রোটিও চালাক। যদি কেউ তাকে পাক করে খাওয়াতে বলে তবে তৎক্ষণাৎ সে পাকে লেগে যায় এবং প্রত্যেক বেলার জন্যমাত্র

এক শিলিং দাবী করে। এতে আমার ভালই হয়েছিল। দু-বেলা দু-শিলিং খরচ করে নানারূপ ব্যন্জন এবং ভাল ভাত পেতাম। এই শহরের আবহাওয়া অন্য রকমের। এখানেও নানা দেশের লোক আছে এবং তারা প্রায়ই বৃহত্তর রাষ্ট্রনীতির চিন্তা করেই সময় কাটায়। প্যান-ইসলাম, প্যান-আফ্রিকান প্যান-আরব এসব ভণ্ডামী এখানে না দেখতে পেয়ে সুখী হয়েছিলাম। ভারতীয় বোরা শ্রেণীর লোকই ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভারতীয় বোরাদের মাঝে পর্যটক প্রীতি বেশ আছে। তারা কোন সভা-সমিতির পক্ষপাতী নয়। এক স্থানে বসে নানা দেশের কথা শুনতেই ভালবাসে। এখানকার সিয়াগণ সুন্নি-বিরোধী। "সুন্নিরা পৌত্তলিক প্রমাণ করতে গিয়ে একজন ভদ্রলোক কাবার কথা বললেন। কাবাতে নাকি এখনও একটি কালো পাথর আছে যাতে চুম্বন না করলে হাজী হওয়া যায় না। হজরত মহম্মদ নাকি পৌত্তলিকদের সংগে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।" আমি মুসলমানদের তীর্থস্থানে যাইনি বার বার বলা সত্ত্বেও এসব অপ্রাসংগিক কথা বলে কথকগণ সময় কাটাতে আরাম বোধ করছিলেন।

এখানকার চায়ের দোকানগুলিতে আসলেই মনে স্ফূর্তি হয়। প্রত্যেকেই চায়ের দোকানে এসে ভাবের আদান-প্রদান করে। নানারূপ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। আলোচনার সময় একে অন্যকে সম্মান করে কথা বলে। অপরের কথা সহ্য করার ক্ষমতা প্রায় লোকেরই আছে। আরব, ইরাণী এবং উত্তর-আফ্রিকার অনেক লোক সন্ধ্যার পর এসে চায়ের দোকানে সমবেত হয়। আমার মনে হয় আরবদের কাছ থেকেই এখানকার লোক অন্যের কথা ধৈর্যের সহিত শুনতে শিখেছে। আরবগণ ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু ভারতবাসী

হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক বৈজ্ঞানিক প্রথামতে ধর্মচর্চা করতে রাজি নয়। আল্লা এবং ভগবান যেন এদের কোন নিকটস্থ আত্মীয়। এ সম্বন্ধে সামান্য উচ্চবাচ্য করলে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের যেমন লাগে অন্যান্যেরা তেমন কিছুই মনে করে না। কাইরো অথবা আলেক্সজেন্দ্রেরিয়া হতে যে সকল ব্যবসায়ী কার্য উপলক্ষে দক্ষিণে আসে তারা ভারতবাসীর প্রতি ভয়ানক বিরূপ। উত্তরের আরব, ভারতবাসীর সংগে মন খুলে কথা বলতেও রাজি হয় না। আমাকে এক জন আরব বলেছিলেন, "ভারতবাসীর মাঝে বেণেরাই সবচেয়ে শিক্ষিত। আমি তার কারণ জানতাম। এদিকে যে সকল গুজরাতী বেণে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে তারা বেশ উদার এবং ধর্মকথা নিয়ে অনর্থক অপরকে হয়রাণ করে না। আমি যখন চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম তখন আরবগণ আমাকে ঘিরে বসত এবং নানা দেশের সংবাদ নেবার পর প্রত্যেকে আপন আপন থলিয়া হতে আমাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করত। এসব আরবদের মাঝেও কতকগুলি কুসংস্কার আছে। তাদের কাছে মানিবেগ থাকে। কোন জিনিস কেনার সময় তারা মানিবেগে রক্ষিত অর্থের ব্যবহার করে। কিন্তু আমাকে কিছু দেবার বেলা তারা তাদের অতি যত্নে রক্ষিত থলিয়া হতে দেশ-বিদেশের মুদ্রা হতে কিছু দিত।

আমাদের দেশে নিষ্ঠা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। নিষ্ঠাবান লোক আমি খুব কমই দেখেছি, কিন্তু আরবগণ যখন তাদের থলি খুলে অর্থ দান করত তখন তাদের মুখে নিষ্ঠার একটা ভাব আপনি ফুটে উঠত। এখানকার নিগ্রোরা বড়ই সৎ এবং অমায়িক, তবে এশিয়াটিক্ জাতের বিরোধিতা করতে এরা যেন ক্রমেই আগিয়ে আসছে। ইস্‌লাম, খৃষ্টান এ সব ধর্ম যেন তারা বেশ অবহেলা করে

নিগ্রোদের পুরাতন মতবাদ গ্রহণ করার প্রত্যাশী হয়ে উঠছে। এখানে বিদেশী লোক নিগ্রোদের জন্য প্রাইভেট স্কুল খুলতে পারে না। যদি কেউ তিন চার জন ছেলেমেয়ের বেশী একত্রিত করে কিছু শিক্ষা দেয় এবং মিশনারীরা সে বিষয়টা জানতে পায় তবে শিক্ষককে আইনের কবলে ফেলতে পারে। এশিয়াটিক বিদ্বেষ নিগ্রো-অন্তরে স্থান নেবার প্রথম কারণ হ'ল, আরব এবং ইউরোপীয়ানদের নিগ্রোদের প্রতি নানা রকমের কুব্যবহার। এখানকার নিগ্রোরা প্রকাশ্যেই বলে "যিনি ইলেক-ট্রিক আবিষ্কার করেছেন, তাঁর প্রতি আমরা যে সম্মান দেই এর একটু বেশি সম্মান কোনও অবতার, পয়গম্বর এসবকে দেব না।" টাবোরার এসব চিন্তাধারার মূলে রয়েছে চায়ের দোকান। এখানেই লোকে নানা রকম চিন্তাধারার বিচার করার সুযোগ এবং সুবিধা পায়।

কয়েকজন শিক্ষিত নিগ্রো আমার আসার সংবাদ পাবা মাত্র শহরে আসে এবং নিকটস্থ গ্রামে নিয়ে যায়। গ্রামে যাবার পর আমাকে উত্তম খাদ্য দিয়েই সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল। এখানকার লোক নবাগতকে উত্তম খাদ্য দিয়েই সম্বর্দ্ধনা করে। উত্তম খাদ্যের মাঝে মাছ এবং মাংস ব্যবহার হয় না। গরম ভাত, গরম পরটা, গরম দুধ এবং গুড়ই হল উত্তম খাদ্য। খাবার খাওয়া হয়ে গেলে নিগ্রোরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল—তাদের শরীরের অবয়ব কি করে পরিবর্তন করতে পারে তারই একটা উপায় বলে দিতে হবে। তাদের এ বিষয়ে কিছুটা জানবার আগ্রহ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম এবং গল্পের ভেতর দিয়েই কি করতে হবে বুঝে আসছিলাম। মহাভারতের এবং আধুনিক পুরাণে সেরূপ তথ্যের অভাব নাই। শ্যাম এবং মালয় দেশে এখনও ভারতবাসী, আরব,

এবং ইউরোপীয়ানদের কাছে কন্যা দান করতে পারলে কন্যার পিতা মাতা সুখী হয় এবং গ্রামের লোক বরকে নানা রকমের সুবিধা দিয়ে থাকে। আমার কথায় বেশ কাজ দিয়ে ছিল। বিদেশীর সংগে সাময়িক বিবাহ প্রথা সে গ্রাম সে দিনই প্রচলিত হয়েছিল। সাময়িক বিবাহ প্রথাই নিগ্রোরা মেনে চলে কারণ তাদের ভূমি সম্পত্তির মালিক স্ত্রীলোকই হয়।

টাবোরা হতে রেলগাড়ীতে করে ফের ডুডুমা আসি এবং বেণে মহাশয়ের বাড়িতে পুনরায় খাবারের বন্দোবস্ত করি। এখান থেকে আমার সাথীরা পূর্ণ উদ্যমে আমার সংগে থাকতে আগ্রহ প্রকাশ করে, কারণ তাদের গন্তব্য স্থান হ'ল জ্যাহোন্সবার্গ। সেখানে গিয়ে তারা সোনার খনিতে কাজ করবে। দুঃখের বিষয় এদের সংগে আমি ইরিংগা পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। ইরিংগাতে পৌঁছার পর আমার শরীর ভেংগে যায় এবং দুই সপ্তাহের বিশ্রামের দরকার হয়।

ডুডুমা হ'তে ইরিংগা ৩৩৭ মাইল। এ পথে লোকালয় অতি অল্প। বন, জংগলও বেশি নয়। উঁচু ভূমি। রাত্রে বেশ শীত অনুভব হয়, সকাল বিকালে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর অবশ করে আনে। দুপুর বেলার রোদ অসহ্য হয়। এরূপ আবহাওয়াযুক্ত স্থানে চলা কষ্টকর। প্রথম দিন আমরা একটি গ্রাম পেয়েছিলাম। গ্রামের লোকের সংগে আমাদের দেখা হয় নি। তাদের ঘর খুঁজে একটুও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেল না। এমন কি কাছে কোথাও জল আছে বলে মনে হল না। বিকালের দিকে কতকগুলি বন্য লোক এসে আমাদের ঘেরাও করে এবং সিগারেট চায়। জল এবং খাদ্যের বিনিময়ে আমরা সিগারেট দিতে রাজি হলাম। তারা আমাদের

পথ দেখিয়ে তাদের গ্রামে নিয়ে যায়। গ্রাম পথের বহু নীচে অবস্থিত। কষ্ট করে গ্রামে পৌছে দেখি, গ্রামের পাশ দিয়েই সুন্দর একটি ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে। তাতে গ্রামের সকলে নেংটা হয়ে স্নান করছে। এত শীতে এরা কি করে স্নান করে তা বুঝবার জন্য জলে হাত দিয়া দেখি সে জল ঠাণ্ডা নয়, সামান্য গরম। এরূপ জলে স্নান করতে বেশ আরাম লাগে। টাবোরাতে আমার লেকচার, সাথীরা শুনেছিল। আমি যখন নেংটা হয়ে স্নান করতে জলে নামলাম—তখন আমার সাথীরা গম্ভীর হয়েই থাকল, হাসল না। নদীতে জল অল্প ছিল। কয়টি ছেলে আমার পিঠ বেশ ভাল করে মাটি দিলে পরিষ্কার করে দিল। একটি মেয়েও আমার কাছে আসল না দেখে বুঝলাম স্ত্রীলোকরা তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাই হল তাদের প্রথম নম্বরের স্ত্রীধর্ম। যাদেরকে আমরা বর্বর বলি তাদের মাঝেও এই লক্ষণটি পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠতে দেখে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম।

স্নান করেই গ্রামে গিয়ে খেতে বসি। খাওয়া মামুলী। এক রকমের উদ্ভিদের শিকড় চূর্ণ করে তাই লেই করা হয়েছে। লেই তৈরী করতে দশ মিনিটের বেশি লাগে না। গরম গরম লেই খাবার পর শরীরে বেশ ঘাম হল। দেশে পেটভরে খেলে পরে যেমন উঠতে ইচ্ছা হয় না—সেরূপ অবস্থা হল না। খাবার পরই ইচ্ছা করলে আমরা পথে বের হতে পারতাম, কিন্তু তা না করে গ্রামে রাত কাটানই পছন্দ করলাম। পরের দিন থেকে আমাদের দুঃখ কষ্টের আরম্ভ হয় এবং তারই ফলে শরীর ভেংগে যায়।

লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলে মনে বড়ই কষ্ট পেতে হয়। ডুডুমা হতে রওনা হবার পর আমার মনে ক্রমেই একটা কথা জাগত। সেই কথাটা হ'ল, "আমি

এত পরিশ্রম করে কেন ভ্রমণ করছি তার উদ্দেশ্য কি? এতে আমার কি লাভ হবে? প্রশ্নটার উত্তর পেয়েছিলাম, ভ্রমণ-কাহিনী লেখতে হবে। কিন্তু আবার মনে হল, তা লোকে পাঠ করবে কি? আমার নাম লোকে উচ্চারণ করবে কি? আমাকে প্রশংসা করবে কি? ধরে নেওয়া যাক যদি আমার ভ্রমণ কাহিনী অপাঠ্য বলে জনসমাজ পরিত্যাগ করে তখন আমি কি করব?" ক্রমাগত এরূপ চিন্তাধারা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। নিগ্রোগ্রাম হতে বের হবার সময় গ্রামবাসীকে একটু ভাল কথা বলে যাওয়া, কিছু দিয়ে যাওয়া, তাও ভুলে গিয়েছিলাম।

পথে এসে ভাবলাম, এরূপ চিন্তা করা আমার পক্ষে উচিত কিনা? অনেক চিন্তা করে ঠিক করলাম এরূপ চিন্তা করা আমার পক্ষে উচিত নয়। তারপর ভাবলাম, "এরূপ চিন্তা আমার মনে আসে কেন, নিশ্চয়ই আমি হীনপ্রকৃতির লোক, নতুবা এরূপ চিন্তা আমার মনে আসতে পারে না?" এতে মনে বেশ দুঃখ হ'ল এবং ঠিক করে নিলাম, এখন থেকে চোখ খুলে ভ্রমণ করতে হবে। নিগ্রোদের খুটিনাটি বিষয়ও প্রণিধান করে দেখতে হবে।

পথের দুপাশে একটি নিগ্রো দেখতে পেলাম না। একটি নিগ্রোগ্রামও ছিল না। ক্রমাগত চলছি আর চলছি। বিকালে আমরা রাত কাটাবার জন্য পথেরই পাশে একটি সুন্দর স্থান দেখে বসলাম। জল কোথায় পাব তার চিন্তাও করলাম না। কতক্ষণ বিশ্রামের পর এক জন সাথী জলের সন্ধানে গেল। সে কোথাও জল পেলে না। আমিও জলের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখালাম না। সংগে যে সামান্য জল ছিল তার দ্বারাই রাত কাটাতে সক্ষম হব ঠিক করে বিশ্রামার্থ শুয়ে পড়লাম।

এক জন সাথী বিছানা করল, অন্য জন সংগের খাবারগুলি

তিনটি পাতাতে রেখে তার নিজের ভাগ আপন মনে খেতে লাগল। সে যখন খাচ্ছিল তখন অদূরে ছোট্ট একটা জানোয়ার দেখা গেল। জানোয়ার একটি খরগোষ। খরগোষটি বোধ হয় এ জীবনে মানুষ দেখে নি, সেজন্য সে মানুষকে ভয় না করে মানুষ কেমন হয় তাই দেখতে এসেছিল। খরগোষ দেখে আমার সাথী কপালে চোখ উঠাল। তার পর নানারূপ নৃত্য করে নানা কথা বলে আবার বসে পড়ল, সে আর খেল না। অপর লোকটি ভয়ানক পরিশ্রান্ত থাকায় বিছানাতে শুয়ে রয়েছিল। আমি তাকে ডেকে উঠালাম, এবং জিজ্ঞাসা করলাম অন্য লোকটি এমন করে কেন নৃত্য করল। সে তার বন্ধুকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানালে, "এখানে বিপদের সম্ভাবনা আছে। সে একটি খরগোষ দেখেছে। খরগোষ যেখানেই থাক না কেন, তাকে, হত্যা করে ভক্ষণ করার উপযুক্ত জানোয়ারও সেখানে থাকে। এদিকে সাপের উপদ্রব আছে। তবে ভয় করে লাভ নাই। আমরা পালা করে শুইব। যাতে করে আগুন জ্বালিয়ে রাখা যেতে পারে কাছে সেরূপ শুক্‌না কাঠও ছিল না। লোকটির কথা শুনে আমার বেশ ভয় হ'ল, কারণ সাপকে আমি ঘৃণা করি।

সন্ধ্যা হ'ল। আকাশে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো "হে" ঘাসের উপর পতিত হয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করল। কখন কখন বা দমকা বাতাসে হে ঘাসকে এমনই সুন্দরভাবে আলোড়িত করতে লাগল যা দেখে মনে হ'ল, ঘাসের উপর ছোট ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ সে ঢেউ দেখলাম। তার পরই মনে হ'ল অদূরে কি যেন একটা মাথা উঁচু করেছে, ক্রমেই তার মাথাটা উঁচু হয়ে হঠাৎ লোপ হয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ একজন সাথীকে জাগালাম এবং যা দেখেছি তাই বললাম। সে কতক্ষণ মাথা চুলকিয়ে সাথের

টিপ বাতিটা দিয়ে কি দেখল, তারপর যে দিকে আমি দৃশ্যটি দেখেছিলাম সেদিকেই আগিয়ে চলল। বোধ হয় কুড়ি হাত দূরে গিয়েই সে ফিরে এল এবং সযত্নে রক্ষিত এক খানা লম্বা লাঠি হাতে করে বেশিদূর না যেতেই একটা লম্বা সাপ তাকে যেন আক্রমণ করবে সেরূপ ভাবেই দাঁড়িয়ে উঠল। নিগ্রোটি কোন কথা না বলে তৎক্ষণাৎ সাপটার ঠিক ফণার পাশে এমনি একটা আঘাত করল যাতে সাপটা চিরতরে পৃথিবী হতে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল। সে আরও একটু আগিয়ে গিয়ে সাপটার লেজ ধরে টেনে বের করল এবং সাপটাকে একটা রসির মত কতক্ষণ ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সে আবার নির্বিকার চিত্তে বিছানায় এসে শুয়ে আমাকে বলল, "অনুগ্রহ করে আপনি আজ রাত পাহাড়া দেবেন, আমি এখন শুইলাম।" কিছুই তাকে না বলে আমিও সিগারেটে দম দিয়ে চারি দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

লোকে মুখে মুখেই বলে মরতে চায় কিন্তু অন্তরে বাঁচবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রাখে। এত পরিশ্রমের পরও আমার নিদ্রা আসেনি, কি জানি যদি কোনও বন্য জন্তু এসে আক্রমণ করে। সারাটা রাত জেগে থাকলাম, একটুও ঘুম আসল না। সূর্য উঠবার একটু পূর্বে নিগ্রো সাথীদের জাগিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। বেলা ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ফের রওনা হলাম।

এদিকের পথের দৃশ্যাবলী বড়ই চমৎকার। পাহাড় সবেমাত্র গঠন আরম্ভ হয়েছে। কথাটা শুনতে একেবারে বদখতই মনে হয়। এসম্বন্ধে কিছুই এখন বলা হবে না। এসব হ'ল ভৌগোলিক তথ্য। ভৌগোলিকদের পক্ষে সামান্য ইংগিতই যথেষ্ট।

সেদিন আমরা আনুমানিক কুড়ি মাইল পথ চলেছিলাম, সর্বত্রই

আমি দেখছিলাম, কি করে পাহাড়ের জন্ম হচ্ছে, কি করে নদীগুলি ক্রমেই প্রশস্ত এবং গভীর হচ্ছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে, ভৌগোলিক তথ্য গবেষণা করে সে দিনের পথ চলা শেষ করে আমরা একটি পরিত্যক্ত লোকালয়ে আসলাম। ঘর ক'খানা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের পেছনে তখনও দুধের পুরাতন খালি টিন এবং অনেকগুলি বোতল স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছিল। আমরা সে ঘরেই খাবার ঠিক করলাম। একজনকে জল আনতে পাঠালাম। সে একটা ভাংগা বালতিতে করে পরিষ্কার জল নিয়ে এল। অন্য লোকটি ঘরেরই পেছন হতে কতকগুলি কাঠ কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাল। মিনিট দশেকের মধ্যে চা হয়ে গেল। চা খেয়ে আমরা সিগারেট ধরিয়ে নানা কথা বলা-কওয়া করতে লাগলাম। ঠিক করলাম পরের দিনটাও এখানে থাকব।

বিকাল বেলা মাংসের বান্দোবস্ত করার জন্য একজন সাথীকে বললাম। সে এক টুকরা রুটি দিয়ে একটি ছোট ফাঁদ পেতে আসল। আধ ঘন্টার মাঝেই একটি গিনি ফাউল সেই ফাঁদে আটকে গেল। বিকালে গিনি ফাউলের উত্তম মাংস ভারতীয় প্রথা মতে মাখনের সাহায্যে ভাজা করে খেয়েছিলাম। এদিকে মাংসের অভাব নাই। গরু পাললে দুধেরও অভাব হবে না। নদীতে সামান্য জলেও প্রচুর মাছ দেখতে পাওয়া যায়। মাটি উর্ব্বরা। গৃহস্বামীর পরিত্যক্ত ঘরে নানারূপ বীজ ছিল। সেই বীজগুলি হতে নানা রকমের সবজি আপনি হয়ে রয়েছিল। সবজির সংব্যবহার করার জন্যই পরের দিন এখানে থাকব বলে ঠিক করেছিলাম। আমাদের সংগে লবণ, লংকা এবং মাখন ছিল। সেইজন্যই সবজি সংব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়েছিলাম।

এখানে রাত্রে আমাদের জেগে থাকতে হয় নি। প্রকাণ্ড একটা আগুন জ্বালিয়ে তারই পাশে শুয়ে রয়েছিলাম। পরের দিন কয়েক

জন সিনেমার একটর এবং একট্রেস এসে আমাদের কাছেই আড্ডা করলেন। তাঁরা সকলেই ইউরোপীয়ান। তাঁদের চিত্র উঠানো হয়ে গেলে সকলেই আমাদের কাছে এসে বসলেন এবং নানারূপ গল্প-গুজব করতে লাগলেন। একজন কেমেরাম্যান আমাদের ফটো উঠাবার জন্য বড়ই উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। আমি তাতে রাজি হলাম না, কারণ আমাদেরই ফটো যদি কোন নিকৃষ্ট কাজে লাগিয়ে দেয় তবে আমার জাতের অপমান হবে। কেমেরাম্যানকে কথাটা বুঝিয়ে দিতেই সে আমার আরও কাছে এসে বসে বলল, আজ পর্যন্ত ফটো উঠাতে কেউ গররাজি হয় নি, অথবা এমন সুন্দর কারণও দেখান নি। আপনাকে সেজন্য ধন্যবাদ। ভারতবাসী শীঘ্রই স্বাধীন হবে।

প্রশংসা এক আজব চীজ। কাককে প্রশংসা করে শৃগাল মাংস খেল। আজ আমাকে এক জন বিদেশী স্বদেশপ্রেমিক বলে প্রশংসা করার জন্য আমার মনটাও বেশ চাংগা হয়ে উঠল। ঠিক করলাম নিজের কাজের জন্য যদি স্বদেশের এবং নিজের জাতের মংগল হয় তবে তেমন কাজই করব। আমাকে যদি কেউ প্রশংসা করে তবে বুঝব সে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে আসছে।

সিনেমা পার্টির সংগে কয়েক জন নিগ্রোও ছিল। তাদের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাতে। তারাও বেশ ভাল করে আমার সাথীদের সংগে তাদের নিজের ভাষায় কথা বলতে পারছিল। একজন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা একে অন্যে বেশ ভাল ভাবেই কথা বলছ। এক জনের দেশ হ'ল পূর্ব আফ্রিকা এবং অন্য জনের দেশ হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকা, তোমাদের উভয়ের ভাষার সংগে কি কোন সম্বন্ধ রয়েছে?" আমার সাথী আমাকে বলল—যে কোন স্থানের নিগ্রো অন্য নিগ্রোর সংগে কথা বলতে পারে। জুলু, টিকুউ, বান্তু সকলেরই এক ভাষা,

শুধু স্থানের নাম অনুযায়ী ভাষার বিভিন্ন নাম হয়েছে। তাদের ভাষায় অতি অল্প শব্দই আছে। লোকটি বলল, অতীত যুগ হতে গ্রীক এবং আরবী শব্দের ব্যবহার তাদের ভাষার প্রচলিত হচ্ছে। গ্রীক এবং আরবী শব্দ পরিত্যাগ করলেই একের ভাষা অন্যে বুঝতে পারে। সাথীদের কথায় কোন প্রতিবাদ করলাম না, শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম কথাটি সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করার জন্য। পরীক্ষা করে জানতে পারলাম, সাথীরা যা বলেছিল তা ঠিক।

সিনেমা পার্টি চলে গেল। আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। সকাল বিকাল বেশ খাওয়া হল, কারণ নবাগত নিগ্রোরা মায়া নামক স্থান হতে চাল এনেছিল, তারই কতকটা আমাদের দিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের ক্রমাগত ছয় দিন চলতে হয়েছিল। এ ছয় দিন খাওয়া এবং ঘুম মোটেই হয় নি। সপ্তম দিন রাত দুপুর বেলা ইরিংগা পৌঁছি এবং আমার সাথীরা আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে সে রাত্রেই কোথায় চলে যায়। আমি সাইকেল চালিয়েও তাদের সংগে চলতে পারছিলাম না। এটাই হ'ল তাদের বিরক্তির কারণ। যাবার বেলা আমার গচ্ছিত টাকাগুলি হিসাব করে দিয়ে যেতে ভোলে নি। অন্ধকার রাতে তারা নোটগুলি গুণে আমার হাতে দিয়ে বলল, "এই নেন আপনার গাচ্ছিত টাকা, দেখে নিন, শ্বেতকায়রা নিগ্রোদের বদনাম করতে পনচমুখ। যাতে এই বদনাম হতে রেহাই পাই সেদিকেও একটু দৃষ্টি রাখবেন। এখন আমরা চললাম, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। আপনার মত আমরা পর্যটক নই। আমাদের সময়ের মূল্য আছে।

ইরিংগাতে এসে গভীর রাতেই আমি একটি সিন্ধি ধনীর দোকানে গিয়ে উঠলাম। দোকানের দুজন যুবক আমাকে সাদর-সম্ভাষণ করল।

আমি একখানা পরিত্যক্ত বিছানায় শুয়ে পড়লাম এবং বললাম যে পর্যন্ত আমার ঘুম না ভাংগে সে পর্যন্ত দয়া করে যেন কেউ আমাকে না ডাকেন। পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে স্নান করেই দোকানের একটি নিগ্রো মজুরকে ডেকে শরীর হতে ডু ডু পোকা বের করতে বললাম। অনেকগুলি ডু ডু পোকা শরীর হতে বের করে সে আমাকে বলল, বাস আজ এই পর্যন্ত, এখন খেয়ে শুয়ে থাক, কাল সকালে ফের স্নান করে আমাকে ডেকো, আমি আবার তোমার শরীর পরীক্ষা করব।

পরের দিন আবার শরীর পরীক্ষা হল। অনেকগুলি ডু ডু পোকা শরীর হতে বের হল। সিদ্ধি যুবকগণ শরীর পরীক্ষা করল, তারপর টিনচার আয়ডিন্ ক্ষতস্থানগুলিতে লাগিয়ে দিল। দুপুর বেলা একটা গরম জলের চৌবাচ্চাতে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। কতক্ষণ বসার পর দুজন নিগ্রো ডাক্তার আমার শরীর পরীক্ষা করে আরও কতকগুলি ডু ডু পোকা বের করে বলল, আগামী কল্য তারা ফের আসবে। মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। আমার শরীরে এত পোকা কোথা হ'তে এল তাই ভাবতে লাগলাম।

দোকানের মালিকের আদেশে আমার সমুদয় কাপড় ফুটন্ত গরম জলে সিদ্ধ এবং ইস্ত্রি করে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হল। বুঝলাম এদেশের মাটি আমার পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। ইরিংগাতে থেকে ক্ষত স্থানগুলি আরাম করতে পনর দিন লেগেছিল। ঠিক করলাম এখান হতে মোটরে ভ্রমণ করাই উচিত হবে।

ইরিংগাতে থাকার সময় একটি বেটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। খেলার মাঠে এক ঘন্টার বেশি ছিলাম না। থাকতে ইচ্ছাও হচ্ছিল না, কারণ ইণ্ডিয়ানরা তাদের মনের দুর্বলতা পদে পদে দেখাচ্ছিল।

দুদিন পর ইরিংগার ইণ্ডিয়ানরা আমার অভিজ্ঞতা শুনবার জন্য একত্রিত হয়। আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলার পূর্বে সভাতে যারা বসেছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা ইউরোপীয়ানদের এত ভয় করেম কেন?" সে কথার জবাব কেউ দিতে সক্ষম হন নি। কেন আমরা ইউরোপীয়গণের ভয় করি সে কথার উত্তরে অনেক কথাই বলেছিলাম। আমার কথা শুনে অনেকেই সুখী হয়েছিলেন। সভাতে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করলেন, কোন জাতের মানুষকেই তারা ভয় করে চলবেন না। লেকচার দিবার কয়েক দিন পরই ইরিংগা হতে মোটর যোগে রওনা হবার বন্দোবস্ত করি। ইরিংগা হতে মবিয়া নামক স্থান ২৮৩ মাইল। এই পথটুকু আমাদেয় দুদিনে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, কারণ এদিকের মোটর রোড একেবারে বাজে। পথে কয়েকখানা গ্রামও এসেছিল, কিন্তু কোথাও মোটর গাড়ী থামল না। পথে আমার মাতানানা নামক স্থানে রাত কাটিয়েছিলাম। এখানে নিগ্রো এবং ইউরোপীয় উভয় রকমের হোটেল ছিল।

নিগ্রো হোটেল অবিকল আমাদের দেশের মতই সজ্জিত। খাবার এবং থাকবার স্থান পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম আমরা নিগ্রো হোটেলেই নেমেছিলাম। নিগ্রো হোটেলে খেয়ে সেখানে না থেকে ইউরোপীয় হোটেলে চলে এলাম। নিগ্রো হোটেলে মাটিতে বিছানা করে শুইতে হ'ত। ইউরোপীয় হোটেলে লোহার স্প্রিংওয়ালা খাটে গদির উপর সুন্দর বিছানা সজ্জিত ছিল। বিছানার লোভেই আমাদের ইউরোপীয় হোটেলে আসতে হয়েছিল। এ দিকেও ডু ডুর ভয় থাকায় মাটিতে শোওয়া পছন্দ করি নি। ইউরোপীয় হোটেলের মালিক তখন ঘরে ছিলেন না, তাঁরা স্ত্রী আমাদের থাকার ঘর

দেখিয়ে দিলেন। আমরা প্রত্যেকে খাবার এবং শুইবার জন্য পনর শিলিং করে দিয়াছিলাম। আমার সংগে অন্য আর একজন ভারতীয় ভদ্রলোকও ছিলেন। তিনি ধর্মে আগাখানী খোজা। তিনিই আমাকে এই ইউরোপীয়ান হোটেলে নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি ধর্ম সম্পর্কিত আইন কিছুই মানতেন না এবং বলতেন, আগা খাঁ যেমন মানুষ তিনিও তেমনি মানুষ। অতি সংক্ষেপে বলছি, তিনি ভগবান বলে কিছুই স্বীকার করতেন না, সেজন্যই তিনি তাঁর সমাজ হতেও বিতাড়িত হয়েছিলেন। এই ভদ্রলোক হোটেল-গিন্নির সংগে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বল্লেন, "যদিও আমার সাথী দেখতে কালো, তবুও তিনি আমাদেরই একজন। তাঁর মতিগতি প্রগ্রেসিভ।" ভদ্রলোকের কথা শুনে হোটেল-গিন্নির মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিলেন এবং স্নান করে আসলে এক পেয়ালা চা দেবেন সেকথাও জানালেন। সুন্দর বাথরুমে গরম জলে স্নান করে বেশ আরাম পেলাম। হোটেল-গিন্নি এক পেয়ালা চা হাতে করে আমার সামনে ধরে বললেন, "তবে আপনি আমাদেরই লোক, বলতে পারেন আপনার শরীরে কয় রকমের রক্ত আছে?" আমি বললাম, "আমার শরীরে, আমার জানা-মতে তিন রকমের রক্ত আছে" এবং কি কি রকমের রক্ত আছে তাও বলে দিলাম। হোটেল-গিন্নি আমার কথা শুনে চমৎকৃত হলেন এবং তাঁদের গাভীগুলি দেখতে নিয়ে গেলেন। হোটেল-গিন্নির ষোল-সতের বৎসরের মেয়ে তখন গাই দোয়াচ্ছিল। আমরা দূরে থেকে তার কাজ দেখতে লাগলাম। কতক্ষণ পর হোটেল-গিন্নি চোখের জল ফেলে বললেন, "আমার এমন সুন্দর এবং কর্মঠ মেয়ে কাকে বিয়ে

করবে জানি না, বড় দুঃখের সংগে বলছি, তাকে যদি তার স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করতে হয় তবে সে বড়ই দুঃখিত হবে। সে মজবুত মেয়ে। ঘোড়ায় চড়তে পারে; বন্দুক চালাতে পারে, মাঠে কাজ করতে পারে, এবং এরই মাঝে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাসও করেছে!"

হোটেল-গিন্নির চোখের জল দেখে আমার দুঃখ হল। আমি তাঁকে বললাম, "এরূপ নির্যাতন সহ্য করতে হবেই, যে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের বুকের উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডবলীলা করবে।" তাঁর ছোট ছেলেটিও কাছে ছিল। এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে সে জেনে নিয়েছে। সে আমাকে বলল, "আমি সাম্রাজ্য-বাদীদের সংগে লড়াই করব। আমি জাতে ইংলিশ, যদি সাম্রাজ্যবাদী ইংলিশদের সংগে লড়াই করতে হয়, তাও করব। আমরা পৃথিবীতে সাম্যবাদ নিয়ে আসব" তারপরই তার মায়ের ফ্রক্ ধরে একটা টান দিয়ে নিকটস্থ আপেল গাছে চড়াবার জন্য আদেশ চাইল। তার মা তাকে সেই কাজটি থেকে বিরত থাকতে বললেন।

রাত্রে আমাদের নিয়ে অনেকগুলি ইউরোপীয়ান একই টেবিলে খেল। কেউ আমাদের ঘৃণা করল না। সকলেই আমাদের সংগে করমর্দন করল এবং অনেকেই বলল এটাই হল আমাদের মিলন ক্ষেত্র, এখানে বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, এখানে আমরা সকলেই সমান, এটাই আমাদের "ক্যাম্‌পেন্"। বিছানায় যখন শুয়ে পড়লাম, তখন ভাবতে লাগলাম, আফ্রিকাতেও তবে মানুষের আগমন হয়েছে। সকাল বেলাই আমরা উঠতে বাধ্য হলাম। ফের আমরা খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। খাবার খেয়ে পথে বের হবার পূর্বে একে অন্যে করমর্দন করলাম। বিদায়ের পর মনে হল যেন বন্ধুকে পথে ভুল করে ফেলে এসেছি।

আজ আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। ড্রাইভারের হাবভাব দেখে বুঝলাম দুই-একশ মাইলের ভেতর কোথাও জল পাওয়া যাবে না। জলহীন স্থানে মানুষও বাস করে না। সংগীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, জল সর্বত্রই আছে তবে জল উঠিয়ে আনার সুবন্দোবস্ত নাই। পূর্বেই বলেছি পূর্ব আফ্রিকার নদী মোটে গজাতে আরম্ভ করেছে। কোনটা কল্লোলিনী, কোনটা প্রস্রবণ আর কোনটা এখনও নদীতে পরিণত হয় নি। সংগীর কথা শুনে জলের চিন্তা হতে মুক্ত হলাম।

গাড়ি চল্ল। ক্রমেই গাড়ির বেগ বাড়তে লাগল। ঘণ্টায় ষাট মাইল করে চলতে লাগল। দুপাশের দৃশ্যাবলী ছায়াচিত্রের মত দেখাতে লাগল। তবে পথের দুপাশ যে সুজলা সুফলা তা ছায়াচিত্র দেখেও অনুভব হল। সূর্য যখন মাথার উপর উঠল তখন গাড়ি থামল। আমরা গাড়ি হতে নেমে একটি নিগ্রো রেস্তোরায় গেলাম। সুন্দর ইংলিশ চা এবং পবিত্র গরুর দুধের ঘিয়ে ভাজা মোটা রুটি আমাদের সামনে বয় এনে রাখল। নিগ্রোদের ইংলিশ চা অর্থাৎ লিপ্টন, দারজিলিং অথবা আসামের চা খেতে দেওয়া হয় না। এসব চা-কেই ইংলিশ চা বলা হয়। আফ্রিকারই কোথাও এক রকমের চা হয়, তাই নিগ্রোরা চা বলেই খায়, তবে তাতে চায়ের গন্ধ নাই। এখনও নিগ্রোরা ঘিতে ভেজাল দিতে শেখেনি এবং ভবিষ্যতেও শিখবে না, কারণ নিগ্রোরা আমাদের মত অমানুষ লোভী নয়, তাদের ভেতর এখনও সামাজিক ছোট বড় বলে কিছুই নাই। মান ইজ্জত বজায় রাখার জন্য তাঁদের কষ্ট পেতে হয় না।

উত্তম খাদ্য খেয়ে ফিরে আসব এমনি সময় দেখলাম একটা

নিগ্রো একটা বড় বৃষকে জংগলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম এটাকে হত্যা করা হবে। সুখের বিষয় নিগ্রোরা এখনও তথাকথিত ধর্মের নামে কোনও জীব হত্যা করে না। গৃহপালিত জীবকে খাবার জন্যই হত্যা করে। গৃহপালিত জীবকে হত্যা করতে কেউ পছন্দ করে না। আমরা কিন্তু কালীর দরজায় পাঠা বলি দিয়ে দেনা শোধ করি। মুসলমানেরা জবাই করে পুণ্য অর্জন করে। নিগ্রোরা সে ধরণের "ধর্মকর্ম" এখনও শেখে নি।

আবার গাড়ি চলল। এবার তত বেগে নয়। একটু ধীরে। আমরা পথের দৃশ্যাবলী দেখেই চললাম। সর্বত্র সুজলা সুফলা সমতল ভূমি। এই ভূমিখণ্ড একদিন দুনিয়ার ইহুদী, বৃটিশের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি। ভবিষ্যতে পাবে বলেও মনে হয় না, অথচ এতবড় একটা দেশ পতিত করে রাখা হয়েছে। কে কখন এসে এই পতিত জমি আবাদ করবে তা বলা বড়ই কষ্টকর। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এমন সুন্দর স্থান বেশি বৎসর অনাবাদী করে রাখতে সক্ষম হবে না।

বেলা তিনটা হতেই পার্বত্য ভূমি দেখতে পেলাম। পার্বত্য ভূমি সমতল ভূমি হতে আরও সুন্দর। সর্বত্র ছোট ছোট নালা বয়ে পরিষ্কার জল নীচের দিকে মন্থর গতিতে চলেছে। নানা রকমের পাখী সেই সুন্দর জলে স্নান করছে, ঠোঁট ডুবিয়ে পান করছে আর কোন কোন পাখী স্নান করার পর ডানা বিস্তার করে কখন বা ডানাতে ঝাঁকানি দিচ্ছে আর কখন বা ঘাসের উপর নীরবে চুপ করে বসে আছে। আমাদের মোটর-খানা যে মুহূর্তে তাদের কাছে পৌঁছল অমনি তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে লাগল। এমন সুন্দর ভূমিও অনাবাদী। আবাদ করতে দেওয়া হয় না, বলা হয় এখানে "ইয়েলো

ফিভার" আছে। স্বর্ণখনিকে "ইয়েলো ফিভার" মারাত্মক রোগের জন্মস্থান আখ্যা দিয়ে পরে বাইরে প্রচার হয়। দুঃখের বিষয় এসব কথার প্রতিবাদ কেউ করে না, আমি শুধু দেখে গেলাম, বল্লামও, তবে আমার কথার কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না, কারণ আমার পাঠক-শ্রেণী হলেন বাংগালী। বাংগালী পরাধীন। পরাধীনের কথা কেউ শুনতে রাজী নয়।

বেলা সাতটার সময় আমরা একটি ছোট পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলাম। পাহাড়ের পথের দুদিকে সুন্দর পাইন বৃক্ষ রোপা হয়েছিল। পাইনগাছগুলি এখন বেশ বড় হয়েছে। দেখতে বেশ সুন্দর দেখায়। পাইন গাছগুলি জার্মানদের রাজত্বের সময় রোপণ করা হয়েছিল, সেজন্যই গাছগুলি লাইন-বাঁধা। বৃটিশরা কখনও পাইন গাছ রোপণ করে না, তারা পাইনের দানা জমির উপর ছড়িয়ে দেয়, পরে যখন গাছগুলি বড় হয় তখন আবাদকারী গাছগুলি কেটে ফেলে। পাইন বাগিচার শেষ সীমান্ত হতেই মরিয়া শহর আরম্ভ হয়েছে।

আমরা শহরে এসে সর্বপ্রথম ইউরোপীয়ান বসতিতে গেলাম। সেখানে আমাদের নাম ধাম এক জন বৃটিশ অফিসার লেখে আমাদের ছেড়ে দিলেন। আমরা ফের ইণ্ডিয়ান শহরে আসলাম। মরিয়া শহর লম্বায় চওড়ায় এক মাইলের বেশী হবে না। দক্ষিণ দিকে জার্মানরা থাকে আর উত্তর দিকে থাকে ইণ্ডিয়ান্। জার্মানরা ব্যবসা করে। সরকারী চাকরি তাদের দেওয়া হয় না। ইণ্ডিয়ানরাও ব্যবসা এবং ছোটখাটো সরকারী চাকরিও পায়। আয়ের দিক থেকে স্থানীয় জার্মানরা ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে কমই রোজগার করে কিন্তু তাদের পাড়ায় গেলে নয়ন তৃপ্ত হয়, আর ভারতীয় পাড়ায় আসলে মন আপন হতেই ছোট হয়ে যায়। এখানকার ইণ্ডিয়ানদের ঘর নীচু এবং অপরিষ্কার। দরজায় কাঁচ লাগানো

নাই। ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেই দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগে। গোদুগ্ধের ব্যবহার অতি অল্প এবং গোদুগ্ধ হতে ক্রিম, দই, তাজা মাখন, এসব বিক্রি করার একখানাও দোকান নাই। মবিয়ায় জার্মানদের লোকসংখ্যা হবে কুড়ি জন। এই কুড়ি জন লোক দুটি রেঁস্তোরায় যায় এবং তাদের রেঁস্তোরা বেশ গুলজার। তিন হাজার ভারতবাসী এখানে বাস করে। এদের একখানা রেঁস্তোরা অথবা হোটেল নাই। অনেকে বলতে পারেন ভারতবাসী উদার তারা বড়ই অতিথিপরায়ণ। যারা এসব কথা বলে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই রাখে না। আজ যদি এখানে একটি ইণ্ডিয়ান হোটেল অর্থাৎ শুইবার স্থান থাকত তবে আজই আমি এখান থেকে চুনিয়া রওয়ানা হতে বাধ্য হতাম না।

আমাদের মোটর লরী এক জন সিন্ধ ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি সে দোকানে গেলাম এবং আমার পরিচয় দিলাম। দোকানীর কাছেই একজন পারসী ভদ্রলোক বসা ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আমার সংগে করমর্দণ করলেন এবং সিন্ধি ভদ্রলোককে বল্লেন, "আজ আমি এঁকে চুনিয়া নিয়ে যাব। প্রকাশ্যে ইনি চুনিয়া যেতে পারবেন না। আমি যদি নিয়ে যাই তবে তাঁর কোনরূপ বেগ পেতে হবে না। সিন্ধি ব্যবসায়ী তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং সেদিনই আমরা সন্ধ্যার অন্ধকারে চুনিয়ার দিকে অগ্রসর হই। গাড়িতে বসেই পারসী ভদ্রলোক বললেন "আমার মোটর পরীক্ষা হয়ে গেছে, সেজন্যই আপনি আমার সংগে যেতে পারছেন নতুবা চুনিয়া দেখা আপনার হ'ত না। চুনিয়া যেতে হলে দুই শত পন্চাশ ইংলিশ পাউণ্ড জমা রেখে তারপর চুনিয়াতে রওয়ানা হতে পারতেন কারণ চুনিয়ার কাছেই স্বর্ণখানি রয়েছে।

মোটরকার ড্রাইভার কয়েক মাইল গিয়েই বাঁ দিকে মোটর

ফেরাল এবং পাহাড়ের গা বয়ে যে পথটি চলেছে তাই ধরে চলতে লাগল। বোধহয় দশমাইল চলার পরই নতুন দৃশ্যাবলী আমার সামনে এবং পেছনে আসতে লাগল। সামনে ছিল প্রকাণ্ড একটি পর্বত, আর নীচের দিকে ছিল ছোট ছোট নিগ্রো জনপদ। জনপদগুলি পরিষ্কার স্থানে অবস্থিত। দুটি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যেখানে নদী বয়ে চলছে তার আশেপাশে ভীষণ বন। সে বনের কাছে নিগ্রো বসতি ছিল না। নিগ্রো বসতি ছিল পাহাড়ের গায়ে যেখানে দূর্বাদল পাহাড়টাকে একেবারে শ্যামল করে রেখেছে। দূর থেকে নিগ্রো রমণীদের দিনান্তের কাজ দেখেই আমি নানা কথা ভাবতেছিলাম। অনেক নিগ্রো এবং নিগ্রো-রমণী পর্বতের উপর হতেও নেমে আসছিল। তারা মোটরকারের সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যে যেদিকে পারে সেদিকেই পালাচ্ছিল। তাদের পালিয়ে যাওয়া এক সুন্দর দৃশ্য। তারা প্রায়ই দিগাম্বরী। তাদের অংগ সৌষ্ঠব ছুটাছুটিতে বেড়েই যেত। তাদের মুখে ভয়ার কোন লক্ষণই দেখা যেত না, এতে তাদের প্রতি কারো অনুরাগ হওয়া দূরের কথা বিরাগই হয়ে থাকত বেশি। আমি ছিলাম নির্বিকার এবং অনুসন্ধিৎসু তাই তাদের সরলতাপূর্ণ প্রিমিটিভ অবস্থা দেখে আমার আনন্দ হ'ত। আমার আনন্দ আমার মুখে মোটেই প্রকাশ পেত না। আমি দেখতাম আর ভাবতাম। গাড়ি চলতেছিল। কোথাও মোড় ফেরার সময় উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকতাম সামনে নতুন কিছু দেখব বলে। যখন মোড় ফিরল নতুন কিছু দেখতে পেলাম না, শুধু উপরের দিকেই চলেছি বলে মনে হল তখন আর ভাল লাগল না। মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকালাম, দেখলাম আমরা বহু দূরে, সমতলভূমির বহু উর্দ্ধে এসেছি। আমাদের

নীচে যে ভূমি তা ঢেউ খেলে কোথায় চলে গেছে তার ঠিকানা করাও কষ্টকর। এমনি করে যখন মাইলের পর মাইল চলে গিয়ে আমরা পর্বতের চূড়ায় উঠিলাম তখন আমি পারসি ভদ্রলোককে মোটর থামাতে বললাম। পারসি ভদ্রলোক মোটর থামালে আমি মোটর হ'তে নীচে নেমে পর্বতের চার দিকটা বেশ ভাল করে চেয়ে দেখলাম।

আমাদের সামনে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের ভূমি ক্রমেই ঢালু হয়ে আগিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। ক্রমে ঢালু স্থানটার ডানে এবং বায়ে উলু জাতীয় ছন আর কদম জাতীয় বৃক্ষে পূর্ণ। বহুদূরে কতকটা স্থান যেন ধূসর বর্ণের একটি বন। স্থানটা যেন নড়ছে। যেন তার উপর ঢেউ খেলছে। সেই ঢেউ খেলা আর কিছুই নয়, বন্য চতুষ্পদ জীব আরামে ঘাস খাচ্ছে। তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হবে! আমি সে দৃশ্য দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখবার সুযোগ পাইনি।

মাইল দশেক যাবার পরই আমরা চুনিয়া শহরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পারসি ভদ্রলোক আমাকে তার ঘরে না নিয়ে মিঃ চেলারাম নামীয় এক সিন্ধি ভদ্রলোকের ঘরে থাকতে দিলেন। চেলারাম আমাকে মোটেই পছন্দ করেন নি, শুধু চাকরের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আপন কাজে মন দিলেন। বলছি চাকরের ঘর, তাও আবার ভারতীয় চাকর। ভারতীয় চাকর চাকরই হয়। আমি চাকরের ঘরে প্রবেশ করেই চাকরের বিছানাটা বেশ করে ঝেড়ে তাতে আমার কম্বলটা পেতে ফেললাম, তারপর গেলাম স্নান করতে। তখন বেশ শীত। এই শীতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা চলে না, কিন্তু যার স্থান চাকরের ঘরে হয় তার শীতের সময় ঠাণ্ডা জলেও স্নান করতে হয়। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে এসে

চাকরকে এক পেয়ালা চা দিতে বলায় সে চা দিতে রাজি হল না। মনিবকে সেবা করা যার একমাত্র কাম্য সে তার সমশ্রেণীর লোককে কি করে সাহায্য করতে পারে? আমিও চায়ের জন্য জোর করিনি, কম্বল মুড়ি দিয়েই শুয়ে পড়ি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দোকান এখন বন্ধ হয়েছে। দোকানী চেলারামের ধর্মভাব জেগে উঠেছে, তাই আমার মত অতিথিকে ডেকে এক পেয়ালা চা দান করে কৃতার্থ হলেন। রাতের খাওয়া বেশ ভালই হয়েছিল।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম "জয় সীতারাম, জয় রাম নাম।" ভাবলাম এরা অপরের জয় কীর্ত্তন করে। একবার নিজের জয়ের কথা ভাবে না। ভারতীয় বণিকদের কথা ভেবে আর লাভ নাই। এবার নিগ্রোদের কথাই ভাবা ভাল। সকালে "নাস্তা"র ব্যবস্থা হয়েছিল। নাস্তা করে আমি বের হয়ে পড়লাম নিগ্রো পাড়ার দিকে। মন আমার চিন্তাকুল. একটু যেয়েই একটা নালার কাছে বসে মাটি পরীক্ষা করতে বসলাম। আধ ঘন্টার মাঝেই আমার মাটি দেখা হয়ে গেল। যে দিকে চলেছিলাম সেদিকে পথ ছিল না—গাছের নীচে নীচে যেয়ে এক খানা গ্রামে পৌঁছাইলাম। গ্রাম সবে গড়তে আরম্ভ হয়েছে। কয়েকখানা ঘরও তৈরী হয়েছে। যে কয়খানা ঘর তৈরী হয়েছে তা ভারতীয় ধরণের মেটে ঘর। একজন মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করলাম "তোমরা কাঠের ঘর কর না কেন? মিস্ত্রি বলল, "মহাশয় আমরা কাঠের ঘর কি করে তৈরী করব। সর্বপ্রথম আমরা মহা গরীব দ্বিতীয়ত এদিকে কাঠের ঘর শুধু বিদেশীদেরই করতে দেওয়া হয়. আমাদের কাঠের ঘর গড়বার অধিকার নাই।" "কেন এমন হয় বলতে পার?" লোকটি বলল

"কাঠের ঘর ব্যবহার করলে নাকি আগুনের ভয় আছে। আমরা হয় ত কাঠের ঘরে আগুন লাগিয়ে নিজেই পুড়ে মরব। সেই জন্যই সরকারের এই দয়াপূর্ণ আদেশ।" আমি আর কিছুই বললাম না। নীরবে শহরে ফিরে এসে একখানা ভারতীয় চায়ের দোকানে স্বাধীনভাবে চা খেতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম কি করে পরিবর্তন এসে মানুষকে মানুষের অধিকার দেবে।

একখানা চায়ের দোকান, কয়েকখানা মুদির দোকান আর কয়েকটি বড় বড় দোকান নিয়ে চুনিয়া শহরের গঠন। শহরের সীমানার মধ্যে কোন নিগ্রো বাস করতে পারে না। শহরের বাইরে কতকগুলি বুয়র বাস করে, তারাই হল স্বর্ণখনির মালিক। তারা শহরে আসে, তাদের দরকারী জিনিস কেনার জন্য। এই কয়খানা বড় বড় দোকান তাদের দরকারী জিনিস সরবরাহ করার জন্যই করা হয়েছে। আমি ভেবে পেলাম না, এই ত কয়টি মাত্র বুয়র, তাদের জিনিস সরবরাহ করার জন্য তিনটা মস্ত বড় দোকান রয়েছে। এরা এত মাল কিনে কি করে? পরে একদিন তাদের পাড়াতে গিয়েছিলাম। তারা আমায় তাদের বাড়িতে যেতে বলেনি, আমি নিজেই গিয়েছিলাম।

পাহাড়ের গায়ে কয়েকখানা বাংলো ধরণের বাড়ী। এক বাড়ী হতে অন্য বাড়ী যাবার বেশ সুন্দর পথ রয়েছে। পথের দুপাশে সবুজ পদ্মের বাগান করা হয়েছে। সবুজ পদ্ম বড়ই মূল্যবান। সিসেল জাতীয় উদ্ভিদ। অথচ তারই বাগান। এটা কি কম কথা! উদ্ভিদটি দেখতে একেবারে পদ্মেরই মত। এই উদ্ভিদ দিয়ে পথ ঘাট সাজিয়ে রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। রোজই তাতে দুবেলা জল দিতে হয় তারপর পদ্মের নীচটা খুড়ে তাতে বেশ করে সার দিতে হয়। তবে একবার যদি পদ্ম মাটিতে কামড়ে ধরতে পারে তবে অনেক দিন বাঁচে।

পাহাড়ের গায়ে যতগুলি বনজ গাছ হয়েছে তার প্রত্যেকটির গোড়াটা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে যাতে করে সকলেই এই বৃক্ষরাজির নীচে গরমের সময় বেড়াতে পারে। এতগুলি কাজ দেখতে অনেক মজুরের দরকার হয়। তাদের মজুরী, তাদের খাদ্য এবং বস্ত্র জুগিয়ে যাওয়া কম কথা নয়। এতে অনেক টাকা লাগে। বুঝলাম দোকানগুলি কি করে বেঁচে আছে।

দুদিন পর চেলারামের দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। ভাল খাবার, ভাল বিছানা আমার জন্য বরাদ্দ হল। এই হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ প্রথম আমি বুঝতে পারিনি তবে পরে জেনেছিলাম। চেলারামের দোকানে যে দিন আমি প্রবেশ করি সেদিন হতেই তার জিনিস বিক্রয় এত বাড়ছিল যে এ কদিনের মাঝেই সে কয়েক শ' পাউণ্ড কামিয়ে নিয়েছিল। হিন্দুরা যেমন করে ভাগ্যকে মানে আর কেউ তেমন মানে না। মানসিক দুর্বলতাই তার একমাত্র কারণ। যা হ'ক আমার সময় বেশ আরামেই কাটতে লাগল।

এখানে একটি সিনেমা আছে। আড়াই শিলিংএর কমে কোন টিকিটই বিক্রি হয় না। তারই একখানা টিকিট একজন ধনী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। যথা সময়ে গিয়ে দেখলাম সিনেমা ঘর লোকে ভর্তি হয়েছে। সবাই ব্যবসায়ী। কেহ কেহ মবিয়া এবং মায়া এসব স্থান হতেও এসেছেন। যদিও ফিল্মখানা হিন্দুস্থানী তবুও গুজরাতীরা বলতে লাগলেন গুজরাতী ফিল্ম কত সুন্দর। এতে আমার দুঃখ হল না, হল আনন্দ কারণ গুজরাতীদের পরকে আপন করে নেবার শক্তি এখনও আছে।

সিনেমা ঘরে নানা রকমের বিষয় আলোচনা হতে লাগল। আমি ভেবেছিলাম সিনেমা আরম্ভ হলে এসব বাজে কথা বন্ধ হবে, কিন্তু

তা হল না, কথাগুলি একটু ধীরে চলতে লাগল। সবাক চিত্রে গিয়ে যদি কথা শুনতে না পারা যায় তবে সিনেমা দেখে লাভ কি? এরা তা বুঝে না, আপন আপন ব্যবসায়ের কথা বলছিল। এদের বকবকি আমার ভাল লাগছিল না তাই সিনেমা শেষ হবার পূর্বেই ঘরে ফিরে এসেছিলাম।

চুনিয়া স্বর্ণখনিতে অনেক নিগ্রো বাস করে তাদের প্রার্থনার জন্যে একটা চার্চ হবে, তারই প্ল্যান নিয়ে এক পাদরী বেশ মসগুল হয়ে উঠেছিলেন। তার কার্য প্রণালী আর ভারতে অব্রাহ্মণের বাড়িতে ব্রাহ্মণের কার্যপ্রণালী একই ধরণের বলে মনে হল। যত গীর্জা আছে তার পাদরী হল সবাই শ্বেতকায় কিন্তু শ্বেতকায়দের গির্জায় কোন কৃষ্ণকায় প্রবেশ করতে পারে না। বিষয়টা একদম আমাদের সংগে মিলে যায় দেখে এক দিকে যেমন আনন্দ হল তেমনি অন্যদিকে ভয় হল, আফ্রিকাতেও ভারতের দূষিত বাতাস প্রবেশ করেছে দেখে।

চুনিয়া ছেড়ে আসবার পূর্বে একদিন একটি স্বর্ণখনিতে গেলাম। দেখলাম মাত্র চার হাত মাটির নীচে সোনা পড়ে আছে। নিগ্রোরা "ব্লো" মেশিন দিয়ে তাই পরিষ্কার করছে 'ওর' বস্তায় ভরে বস্তাগুলি যেখান সোনা গলান হয় সেখানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছে। মাটি খুঁড়ে সোনা বুয়রই করুক আর যেই করুক সোনার দাম নির্ণয় করার অধিকার বৃটিশ ধনীদের হাতেই রয়েছে, আর কারো সে অধিকার নাই।

সে দিনই বিকাল বেলা একটি উলুবনের দিকে পায়ে হেটে চলছিলাম। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার দিকে আসছে। আমি আগন্তুকের অপেক্ষা না করে নিজেই আগিয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ

হেটে গিয়ে দেখলাম একজন নিগ্রো একখানা পুরাতন বাইবেল হাতে নিয়ে মন দিয়ে পড়ছে। বাইবেল ইংলিশ ভাষায় লেখা ছিল। বুঝলাম লোকটি ইংলিশ বেশ জানে, তাই তার মনাকর্ষণ করার জন্য একটু কাশলাম। আমার কাশির শব্দে যেন তার তন্দ্রা ভাংগল। সে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল "বানা কি চাই"। আমি বললাম কিছু চাই না, এদিকে আসছিলাম তোমাদের সোনার খনি দেখতে, তুমি নিশ্চয়ই সোনার খনিতে কাজ কর। হাঁ বানা, তবে আজ পর্যন্ত একখানা বাইসাইকেল কেনার উপযুক্ত টাকা জমাতে সক্ষম হইনি এই যা দুঃখ।

বাইরে ভয়ানক রোদ ছিল তার উপর উলুবন। আমি নিগ্রো লোকটির অনুমতি নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরখানা পাঁচহাত লম্বা এবং চওড়া। দুজনায় বসতে কষ্ট হচ্ছিল। কষ্ট করে বসে নিগ্রোকে জিজ্ঞাসা করলাম—

তোমরা দৈনিক কত মজুরী পাও ?

নগদ পঞ্চাশ সেণ্ট ( ছয় আনা ) আর এক সের করে ভুট্টার আটা।

এতে কি তোমাদের পোষায় ?

না, বানা।

তবে এমন কাজ কর কেন ?

একটু লোভ আছে বানা, যদি কোন দিন চাকা সোনার সন্ধান পাই আর তার দু এক টুকরা সরাতে পারি তবেই আর কাজ করতে হবে না।

চোর বলে যদি ধরে ?

চুরি করাটা বেশ শিখেছি। চুরি করা আগে জানতাম না। আমার সাথীরা চুরি করা শিখিয়েছে।

চলত, খনিতে কি করে চুরি করতে হয় তা একটু দেখাও!

বানা, তুমি কে?

আমি একজন পর্যটক। তোমাদের দেশে বেড়াতে এসেছি মাত্র। তুমি ত ইংলিশ জান, এই দেখ আমার পাসপোর্ট, কত দেশের ছাপ তাতে পড়েছে।

নিগ্রো লোকটি আমার হাত থেকে পাসপোর্টখানা নিয়ে মন দিয়ে তাই দেখল তারপর বলল "বানা, তোমাদের দেশে আমাদের যেতে দেওয়া হয় না। সেজন্য তোমরা দায়ী, না বৃটিশ দায়ী?

তুমি কি কখন ভারতে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলে?

হাঁ, বানা, আমি একবার ভারতে গিয়ে মজুরী করার জন্য আবেদন করেছিলাম। শুনছিলাম তোমাদের দেশের লোক নাকি আমাদের দেশের লোক হতে বেশী মজুরী পায়। পাসপোর্ট অফিসার আমার আবেদনে জানিয়েছিলেন যদি আমি এক শত পাউণ্ড জমা রাখতে সক্ষম হই তবে আমাকে ভারতে যেতে দেওয়া হবে। আজ পর্যন্ত একখানা বাইসাইকেল কেনার টাকা জমল না; এখন এক শ পাউণ্ড চিন্তা করাও আমার পক্ষে অন্যায় হবে। নিগ্রোটিকে পুনরায় কি করে চুরি করতে হয় তারই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কি করে চুরি করতে হয় তা দেখাতে সে অস্বীকার করেছিল।

চুনিয়া একটি পার্বত্য সমতল ভূমি। এই পার্বত্য সমতল ভূমি পাঁচ হাজার ফিটের কম উঁচু হবে না। এখানে দাঁড়ালে বহুদূরের দৃশ্য দেখা যায়। পর পর পাহাড়গুলি আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। নিগ্রোলোকটিকে জিজ্ঞাসা করে অবগত হলাম, এখানে বহুদূর হতে লোক কাজ করতে আসে। তবে আজ পর্যন্ত কেউ এখান থেকে বড় লোক সেজে দেশে যেতে পারে নি। যারা চুরি করে বড় লোক হয়েছে তারা

তাদের চুরি করা সোনা এখানে না গলিয়ে আরও দূরে গিয়ে তাই বিক্রী করে ধনী হয়েছে। আমার সল্পপরিচিত নিগ্রোও সেই আশায় আছে এবং কি করে সেরূপ সোনার সন্ধান পাওয়া যায় তাই স্বর্গীয় বাইবেলের পাতায় পাতায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিগ্রোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাফেতে গিয়ে বসলাম। কাফের মালিক তখন একটি বেন্‌চে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। কয়েক জন ইণ্ডিয়ান এবং নিগ্রোও আরাম করে বসে কেউ পাইপ, কেউ সিগারেট টানছিল। যারা বসেছিল তাদের একজন বেঁটে শ্যামবর্ণ লোক এক কোণে বসে কি ভাবছিল। তাকে দেখলেই মনে হয় সে নিগ্রো নয় গৃক। তার কাছে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, মহাশয় কি জাতে গৃক? সে উত্তর দিল, না মহাশয়, আমি গৃক নই "বড্‌ডার লাইনার" (Border Liner)। এরূপ শব্দ এবং এরূপ জাতের নাম কোনদিন শুনিনি। কৌতূহল বেশ জাগল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম বড্‌ডার লাইনার কি হয় যদি দয়া করে জানিয়ে দেন তবে বড়ই বাধিত হব। লোকটি একটু হাসল তারপর বললে "আমার ছেলে মেয়েরা ইউরোপীয় হয়ে গেছে, আমি ইউরোপীয় বলে পরিচয় দেবার এখনও আদেশ পাইনি। এরপরে নানা কথা বলে তিনি বাড্‌ডার লাইনার মানে কি হয় তাই বুঝিয়ে দিলেন।

বুয়র এবং ইউরোপীয়গণ যখন আফ্রিকায় আসছিল তখন তারা নিগ্রো স্ত্রীলোকদেরও পরিবারে রাখত। নিগ্রো স্ত্রীলোকদের ছেলেমেয়েরা ক্রমেই ইউরোপীয়ানদের সংগে মিলে মিশে ইউরোপীয় হয়েছে। তিন চার পুরুষ নিগ্রোস্ত্রীলোকদের ছেলেমেয়েরা ইউরোপীয় অবয়ব পূর্ণ মাত্রায়ই পেয়ে যায়। যাদের মধ্যে কিছুটা খুত থাকে তাদেরই বড্‌ডার লাইনার বলা হয়। নূতন লোকটির দেখা পেয়ে আমার বেশ আনন্দ

হয়েছিল এবং আনন্দের আতিশয্যে রেঁস্তোরার মালিককে ঘুম থেকে উঠিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত করে দিতে বলেছিলাম। চায়ের দোকানের মালিক আমার দিকে চেয়ে বলল, "এত আনন্দের কারণ কি মিষ্টার ?" তাকে জানালাম আজ নতুন ধরণের লোক দেখতে পেয়েছি, এই যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তিনি হলেন বাড়্‌ডার লাইনার। দোকানী বললে, "তাই দেখে এত আনন্দ, যাক আজ আমি আপনাকে আরও নতুন কিছু দেখাব।"

চা খেয়ে আমি সিদ্ধি ধনীর ঘরে ফিরে আসতেই, চেলারাম বললেন, এখনই এক জন লোক তোমাকে নিয়ে গ্রামে যেতে চায়, একটু বস, সে এখনই আসছে। চায়ের দোকানের মালিকের মোটরকার ছিল। তিনি মোটরে করে এসে বাইরে থেকেই আমাকে অংগুলি সংকেতে ডাকলেন। আমি তার মোটরে গিয়ে বসলাম। মোটর ভোঁ ভোঁ করে চলল। আমরা চুনিয়ার পশ্চিম দিকে রওয়ানা হলাম। ঘণ্টা দুই যাবার পর আমরা বেশ বড় একটি নিগ্রো গ্রামে এলাম। এরূপ গ্রাম আফ্রিকাতে কমই দেখেছি। গ্রামের শ্রী আছে। পথ ঘাট সবই পরিষ্কার কিন্তু লোকগুলি বিশেষ করে স্ত্রীলোকগণ একেবারে উলংগ। আফ্রিকাতে উলংগ স্ত্রীলোক অনেক দেখেছি তবে এখানকার মত কোথাও দেখিনি। স্ত্রীলোকদের চক্ষু দেখলে মনে হয় তাদের প্রত্যেকেরই লজ্জা আছে, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, ছেলেমেয়ে এসবের পার্থক্য অনুভবও আছে তবে কেন এরা একেবারে উলংগ থাকে তা মোটেই বুঝতে পারলাম না। পুরুষদের সকলেই ইউরোপীয় পোষাকে আবৃত। এমনকি পুরুষদের গলা হতে মাথা পর্যন্তই বস্ত্রাবৃত। পা পর্যন্ত তারা ঢেকে রাখতে পারলে যেন বাঁচে। স্ত্রীলোক উলংগ আর পুরুষগণ বস্ত্রাবৃত এর কারণ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তবে সকলেই বলে এটা হল তাদের "রেওয়াজ" মানে

নিয়ম। রেওয়াজ আরবী কি পারসী শব্দ হবে তা জানি না তবে কথাটা সোহেলী ভাষায়ও স্থান পেয়েছে।

চুনিয়া স্বর্ণখনিতে নিগ্রোদের দুর্দশা, বুয়রদের রাজকীয় হালচাল, এবং ভারতবাসীর "বেনেবুদ্ধি" দেখে সেখানে থাকতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। এদিকে চুনিয়াতে রটে গিয়েছিল "আমি যার বাড়িতেই যাই, তার বাড়িতেই লক্ষ্মী নাম্নীয় দেবতাটি আমার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে তার বাড়ীতে চলে যান।" মবিয়ার অন্য আর এক সিন্ধি ধনীর কানে সেই কথাটি লোকমুখে পৌঁছেছিল। তিনি বিলম্ব সইতে না পেরে, মোটর যোগে এসে আমাকে বললেন "আমাদের সেখানে চলুন, লোক আপনাকে দেখবার জন্য উৎগৃব হয়ে রয়েছে।" এই কয়টি কথা বলেই তিনি আমাকে নিয়ে মোটরে বসালেন এবং আমার সাইকেল খানা এবং পিঠ-ঝোলাটা নিজেই মোটরের পেছনে বাঁধলেন। মবিয়ায় পৌঁছতে আমাদের দেরী হল না। সেদিনই বিকাল বেলা ইণ্ডিয়ানদের সকলের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করলাম এবং সময় কাটার জন্য কয়খানা নবেল কিনে আনলাম।

মবিয়া হতে আমার মায়া যাবার কথা ছিল। পথে টিঁকুউ বলে একটি বড় গ্রাম আছে। তাও দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। মবিয়া হতে মায়া পর্যন্ত যে বড় পথটা গিয়েছে তার আগাগোড়াই ক্রমেই নীচের দিকে চলেছে। সাইকেলে চলিতে কষ্ট হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু ডিসোজা নামে আর এক গোয়ানী ভদ্রলোক আমাকে ধরে বসলেন। তাঁর বাড়িতে তাঁরই সংগে যেতে হবে এবং কয়দিন থাকতেও হবে। আমি রাজি হয়েছিলাম কিন্তু মবিয়ার সিন্ধি মহাশয় আমাকে ছাড়ছিলেন না। তারও নাকি বিক্রি বেশ ভাল হচ্ছিল।

মবিয়ায় এরোপ্লেনের ঘাঁটি, যায় ইণ্ডিয়ানদের কবর এবং সৎকার

করার স্থান দেখে নিলাম তবুও আমাকে ছেড়ে দেবার নামটি নেই। অথচ মবিয়াতে এমন কিছু ছিল না যা দেখে আমার মন ভুলে থাকতে পারে। এমতাবস্থায়ও পনর দিন থেকে একদিন সকালবেলা ডিসোজার সংগে রওয়ানা হলাম। মবিয়া হতে টিঁকুউ মাত্র পঁয়সট্টি মাইল। মোটরে দুঘণ্টা লাগল। পথে দেখার মত কতকগুলি ছোট ছোট অজগর সর্প ছিল। এই সাপগুলি এতই বোকা যে নিগ্রোরা যখন ইচ্ছা তখনই এদের ধরে হত্যা করে চামড়া বিক্রয় করে দুপয়সা রোজগার করে।

টিঁকুউ পূর্ব-আফ্রিকার প্রসিদ্ধ স্থান। এখান হতে একটি পথ বারকেন্ হেড্ পর্যন্ত গিয়েছে। বারকেন্‌হেডের পরেই হল ভুবন বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া প্রপাত। আমি বারকেন্‌হেডের দিকে না গিয়ে ন্যাসা লেক্ হয়ে যেতে মনস্থ করলাম। সেজন্যই আমাকে মায়া নামক স্থানে যেতে হয়েছিল।

টিঁকিউ আসার পরও দেখলাম এখানকার স্ত্রীলোক একেবারে উলংগ থাকে এবং পুরুষরা মাথা হতে পা পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত থাকে। টিঁকিউর বাজারে নগ্ন স্ত্রীলোকদের ধান চাল, বিক্রয় করতে দেখতে গিয়ে মহা ফেসাতে পড়তে হয়েছিল। যে কোন ভারতবাসীর সংগে আমার বাজারে দেখা হয়েছিল, তারা কেউ আমার সংগে কথা বলেনি। সকলেই লজ্জায় মাথা নত করে রেখেছিল। স্থানীয় ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ ভুলেও বাজারের দিকে যান না। ভারতীয় স্ত্রীলোকগণ পর্দার আড়ালে থেকে সুযোগ পেলে সে দৃশ্য দেখেন। ভারতীয় স্ত্রীলোক পর্দার আড়ালে আর নিগ্রো স্ত্রীলোক দিগম্বরী হয়ে পথে ঘাটে ভ্রমণ করেন। একেবারে সমানে সামাল।

ডিসোজার ধরমশালা এদিকে বেশ নাম অর্জন করেছে। ডিসোজার

ধরমশালার স্প্রিংএর খাটে গদিআটা বিছানায় শুতে বেশ আরাম। খাবারেরও সুব্যবস্থা হয়ে থাকে। নিরামিশ খাবারেরই বন্দোবস্ত হয় কারণ হিন্দুরা মাছ মাংস খায় না, মুসলমানরা আবার জবাই করার পক্ষপাতী। ডিসোজা জবাই করা ভাল মনে করেন না, সেজন্যই নিরামিশেরই ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

টিকুউ-তে অনেক ইউরোপীয়ানও বাস করেন। তাঁরা ভারতীয় গ্রামের বহুদূরে একটি পাহাড়ের উপর বাড়িঘর করেছেন। তাঁদের বাসস্থানে গেলে আফ্রিকার সম্বন্ধে মামুলী একটি ধারণা আপনি এসে যায়। এক দিকে ন্যাসা হ্রদের দৃশ্য এবং তারপরই আবার পর্বতগুলি অন্যদিকে উঁচু হতে উঁচু হয়ে পশ্চিম দিকের দিগন্তের সংগে গিয়ে মিশেছে। জার্মান, বৃটিশ ডাচ্ এ সকল জাতের লোক তাদের ঘরে অবসর সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য ভোগ করে। তাদের বাড়ি ঘর এবং বসবাসের ব্যবস্থা দেখলে মনে হয়, তারাই জানে কি করে সুখে দিন কাটাতে হয়। তাদের স্ত্রীলোকগণও অলস নন। কাপড় কাচা, পাক করা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, এমন কি অনেক সময় জংগল হতে শুকনা কাঠ পর্যন্ত কুড়িয়ে আনতে আমিই দেখেছি। এদিকের নিগ্রোরা আবার ইউরোপীয়ানদের বয় অথবা বাবুর্চির কাজ করতে নারাজ। তারা বলে, এসব কাজ হল স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকের কাজ স্ত্রীলোক করবে, পুরুষ তাদের কাজে ভাগ বসাবে কেন? ইউরোপীয়ানরা এদিকের নিগ্রোদের এসব কাজে নামাতে আজ পর্যন্ত পারেন নি। বাস্তবিক এ বিষয়ে নিগ্রোরা যেন ইউরোপীয়ানদের সমকক্ষ। নিগ্রো স্ত্রীলোককেও ইউরোপীয়দের বাড়িতে কোনও কাজ করতে দেখা যায় না। তারা বলে স্ত্রীলোক হয়ে যারা চাকুরি করে তারা বার-বনিতাদের মতই, দরকার হয় কাজ করে সাহায্য করব, কিন্তু অর্থের

বিনিময়ে কাজ করব না। বান্টু, টিকুউ, বাগাণ্ডা, জুলু, এবং অন্যান্য জাতের মাঝে উন্নত ধরণের রাষ্ট্রনীতির ভাবধারা এসেছে, এদের মধ্যে তা আসেনি সত্যকথা কিন্তু এরা যেরূপভাবে তাদের আত্মসম্মান বজায় রেখে জীবন কাটায় তেমনটি আমাদের দেশেও কম দেখা যায়।

# ন্যাসালেণ্ড

১৯৩৮ সালের জুন কি জুলাই মাসের শেষ ভাগে টাংগানিয়াকা ভ্রমণ সমাপ্ত করে যেদিন মায়া (Myeh) নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম সেদিন হঠাৎ দেশের কথা মনে হ'ল। কখন বৃষ্টি, কখন উত্তপ্ত সূর্য কিরণের ফাঠ-ফাটা তেজ আর কখন বা আকাশ কাল করে মেঘ এবং অনবরত বজ্রপাত। ধান কাটা হয়ে গেছে। বাজারে নিগ্রো রমণীরা টুকরীতে করে চাল নিয়ে এসেছে। চাল বিক্রি হবে তারপর নিগ্রো স্ত্রীলোকেরা সওদা কিনে বাড়ীতে যাবে। আমাদের দেশের কয়েকটি স্ত্রীলোক একত্র হলেই হট্টগোলের সৃষ্টি করে কিন্তু এরা সেরূপ করে না। কেউ কথা বলছে না। এরা শৃংখলা বজায় রাখে, ধৈর্য আছে, আর আছে আত্মসম্মান। কোন ইউরোপীয় অথবা ভারতীয় ওদের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাইতে ও সাহস করে না অথচ প্রত্যেকটি স্ত্রীলোক দিগাম্বরী। দিগম্বরীদের ফটো তুলবার কারো অধিকার নাই। তবে তারা কি প্রত্যেকেই এক এক জন মাটির কালী মূর্তি? তা নয়। তাদের পুরুষেরা সকল সময়ই তাদের রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। পিস্তল বল, ছোরা বল, আর রামদা বল কিছুতেই ওরা ভয় খায় না। আরব এদের কাছে হার মেনেছে, পর্তুগীজ এদের ভয়ে পালিয়ে গেছে, জার্মাণ ওদের স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, আর বৃটিশ মুখ খুলে কিছুই বলে না। ন্যাসাদের স্ত্রী স্বাধীনতা দেখলে মনে হয় ভারতের স্ত্রীলোক যেন ভারতের পুরুষদের দাসী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে।

চালের দর ঠিক হওয়া মাত্র ক্রেতারা তরাজু নিয়ে চাল ওজন করে স্ত্রীলোকদের টাকা দিয়ে যখন বিদায় করে দিল তখন স্ত্রীলোকগণ একে একে উঠে নিকটস্থ ভারতীয় দোকানে গিয়ে তাদের দরকারী জিনিস কিনে বৃষ্টিতে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে আপন আপন বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল। পথে প্রেমিকের দল তাদের পেছন নিল। যখনই স্ত্রীলোকেরা প্রেমিকের দ্বারা বিরক্ত হচ্ছিল তখনই উত্ত্যক্ত স্ত্রীলোকটি একটা হাটু মাটিতে ছোয়ান মাত্র প্রেমিক ভিন্ন পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এদের বিবাহের কোনরূপ বাধ্য বাধকতা নাই। ধর্মের এখানে আদেশ নাই, সমাজে এখানে অন্যায় আবদার নাই. মেয়েলোক এখানে অন্য মেয়েলোককে কটুবাক্য অথবা চুপি চুপি নিন্দা করে না, এখানে স্ত্রীলোক স্বাধীন।

মায়া একটি ছোট গ্রাম। গ্রাম ইউরোপীয় ধরণে গঠিত। গ্রামে গৃহপালিত পশু রাখবার নিয়ম নাই। ন্যাসারা আবার কুকুর বিড়ালও পুষে না। তারা পুষে বেজি। যাদের স্ত্রীলোক দিগম্বরী, যারা মরতে ভয় করে না তারা নিশ্চয়ই পশু ভাবাপন্ন এবং যা তা খায় তাই বোধহয় আমার জাত ভাইরা ধারণা করবেন। কিন্তু সে ধারণা যেন পোষণ না করেন। ন্যাসারা ভাত, সবজী, কখনও সামান্য মাংস এবং মদ খায়। মাছ ন্যাসারা খুব কমই পছন্দ করে। তারা দুধ, দই, মাখন, ক্রিম প্রচুর খায় আর খায় ভুট্টার রুটি। এরা বড়ই দয়ালু এবং তাদের বাড়ীতে গেলে গরম জল এবং গুড় খেতে দেয়। কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে একটি কথা মনে রাখা সমূহ দরকার সেই কথাটি হল ওদের স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও বক্র দৃষ্টিতে না চাওয়া। যদি কোন কুমতলব থাকে তবে চোখ ত যাবেই, উপরন্তু ঘাড়ের সংগে মাথার সংযোগও

বেশিক্ষণ থাকবে না। শুনেছি একবার নাকি শিখ পল্টনের সংগে এরা লড়েছিল। শিখ পল্টন যখন গ্রামে প্রবেশ করেছিল তখন একটি মানুষও গ্রামের জীবিত ছিল না। স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে লড়েছিল।

ন্যাসা হ্রদের উপকূল দিয়ে পথ ছিল না বলেই আমাকে জাহাজে করে যেতে হয়েছিল যদি বলি তবে কথাটার মূল্য বাড়বে না, কথাটাকে খাটই করা হবে। তাই বলছি ন্যাসালেক্ জাহাজে করে পাড়ি দিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।

জাহাজে কেবিন অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর যাত্রী নেওয়া হয় আর নেওয়া হয় ডেক প্যাসেনজার। চাঁদপুর হতে গোয়ালন্দে যারা তৃতীয় শ্রেণীতে জাহাজে ভ্রমণ করেন তাদের বলা হয় ডেকে প্যাসেন্জার, আর যারা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন তাদের বলা হয় কেবিন প্যাসেন্জার। ভারতবাসীকে এখানে কেবিন প্যাসেন্জার করা হয় না। ঘরে বসে অনেক ভারতীয় উচ্চ শ্রেণী হিন্দু ভাবেন তাদের বড় জাত, তাদের অধ্যাত্ম তত্ত্ব আছে, তাদের গুণ গরিমা অফুরন্ত কিন্তু মহাশয়দের বলছি এখানে তাদের কোন গুণই নাই, তারা নিগ্রোদের মতই আফ্রিকাতে ব্যবহার পান। ঘরে বসে হাম্বড় বললে চলে না। ঘরে বাইরে সমান হতে হয়।

স্থানীয় ধনীরা আমার জন্য কেবিন শ্রেণীর টিকিট কিনিতে সক্ষম হননি এই সংবাদ যখন আমার কাছে পৌঁছল তখন ইচ্ছা হল একবার নিজে কাপ্তানের কাছে যাই। কি চিন্তা করে গেলাম না। একদম জাহাজে গিয়ে উঠলাম। জাহাজে উঠা মাত্রই কাপ্তান আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ভূপর্যটক জেনে তৎক্ষণাৎ একটি কেবিন ছেড়ে দিলেন। আমি কাপ্তানকে বলেছিলাম "যদিও

আমাকে বিশেষ দয়া দেখালেন, কিন্তু আমাকে একথা বলতে হবেই আমার দেশবাসীরা আইনমতে আপনার কেবিন ক্লাসের প্যাসেন্‌জার হতে পারে না। কাপ্তান এরপর আর আমার সংগে সাক্ষাৎ করেন নি। আমিও অনেকটা লজ্জিতই হয়েছিলাম, কারণ আমার জন্ম সেই দেশে যেখানে এখনও "জাতিভেদ" বর্তমান, যেখানে এখনও হরিজন বলে এক শ্রেণীর লোক আছে, সেখানে এখনও ব্রাহ্মণ বলে এক শ্রেণীর লোক বড় লোক বলে পরিচয় দেয়, এবং যেখানে এখনও আমার স্বদেশবাসী তাদের জাত ভাইকে ধাংগর, মেথর চামার, ডোম, নম বলে সুখী হয়, যেখানে এখনও হিন্দুর ধরমশালায় মুসলমানদের থাকতে দেওয়া হয় না। সেই দেশের লোক হয়ে আমি কি প্রকারে শ্বেতকায় কাপ্তানকে দোষ দিতে পারি?

আমাদের দেশের কানা পুকুরে যেমন পানা জমে থাকে এবং সেরূপ পুকুরে কেউ পা ধুইতেও ভালবাসে না ঠিক সেরূপ জলে আমাদের জাহাজখানা প্রায় একঘণ্টা চলল। এরূপ চলার সময় আমি নানা রকমের চিন্তায় একেবারে তন্ময় ছিলাম। কতক্ষণ পর হঠাৎ জাহাজ স্বচ্ছ জলে এসে উপস্থিত হল। হ্রদের কিনারা কোন দিকেই দেখা যাচ্ছিল না। উপরে নীল আকাশ আর নীচে নীল জল। তবে এ নীল জল লোনা নয়; আমাদের পুকুরের জলের মতই মিষ্টি।

আমাদের দেশের যে সকল নাবিক সমুদ্রে যায় তারা যখন সমুদ্রে থাকে তখন তাদের জন্য জাহাজে জল বোঝাই করে নেওয়া হয়। সমুদ্রের জল ভয়ানক লোনা এবং কটু। সেই লোনা জলের সংগে তুলনা করে যখন কথা বলা হয় তখন নদীর জলকে মিষ্টি জল বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। মিষ্টি জল কথাটা

নাবিকেরাই ব্যবহার করে, আমি এখন জাহাজের কথাই বলছি অতএব এখন আমার মিষ্টি জল বলবার অধিকার আছে।

সমুদ্র যত গভীর হয় সেই স্থানের জল ততই নীল হয়। আমরা এক ঘণ্টা চলার পরই এমন এক স্থানে এসে পড়লাম যেখানে হ্রদের জল একেবারে নীল দেখাতে লাগল। আন্দাজ করলাম এ স্থানের গভীরতা ভূমধ্যসাগরের যেখানে সব চেয়ে বেশি গভীর জল সে স্থানের সংগে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। আপন মনের মাঝেই সেই ভৌগোলিক তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এমন একটি লোক পেলাম না যার সংগে এ সম্বন্ধে একটু কথা বলি। আমার সংগে অন্য তিন জন ভারতবাসী ছিলেন। একজন ছিলেন মৌলবী, তিনি আল্লার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে পারতেন, কিন্তু সমুদ্রে কি করে জাহাজ চলে এবং কোন দিক উত্তর আর কোন দিক দক্ষিণ সে সংবাদ জানতেন না। অন্য দুজনা ছিলেন ব্যবসায়ী। তারা শুধু টাকা গুনতেই জানতেন এর বেশি আর কিছু জানতেন না। এ সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে আমাকে নীরব থাকতে হয়েছিল।

জাহাজে একজন কংকনী মুসলমান ছিলেন। তিনি ইন্‌জিন ড্রাইভারী হতে তেল ওয়ালার কাজ পর্যন্ত করতেন। তিনি ছিলেন বড়ই সদাশয় লোক। তারই অনুগ্রহে যে কয়দিন জাহাজে কেটেছিল সে কয়দিন দক্ষিণ হাতের কাজ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হয়েছিল। আমার সংগের তিন জন ভারতবাসী, এবং সেই ইন্‌জিন ড্রাইভার যখন একত্র বসতাম তখন ভূতের গল্প বলেই সময় কাটাতাম। আমি মাঝে মাঝে নিগ্রোদের কথা উঠাতাম, তারা নিগ্রোদের সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাইতেন না, এমন কি নিগ্রোরা যে মানুষ তাও বিশ্বাস করতে তাদের যেন কষ্ট হত। নিগ্রোদের দেশে থাকব,

নিগ্রোদের ঠকিয়ে তাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করব অথচ তাদের সম্বন্ধে কিছু জানব না এই হল আমাদের দেশের লোকের অভ্যাস। কিন্তু এরূপ করে কি দিন যাবে? ভারতবাসী যে ভাবে ভবিষ্যত চিন্তা করে পৃথিবীর অন্য কোন জাত সেভাবে তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না। চিন্তাধারার মাঝেও ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্য আছে! বৈশিষ্ট্যতা আর কিছুই নয়, শুধু অদূরদর্শিতা।

বিকাল বেলা স্বচ্ছ আকাশের নীচে, স্বচ্ছ জলের উপর তর তর করে যখন বাষ্পীয় তরণীখানা চলছিল তখন আমার দৃষ্টি দুটি ছেলের প্রতি আপনা হতেই পড়েছিল। একটি ছেলের বয়স পনর হতে ষোল আর অন্যটির বয়স সাত হতে আট বৎসর। উভয় ছেলেকে দেখলেই মনে হয় খাঁটি ইউরোপীয়ান। কোন্ দোষে তারা নিগ্রোদের মত থাকছিল এবং খাচ্ছিল তা জানবার জন্য মন আপনা হতেই উৎসুক হয়েছিল।

বিকেলবেলা দুটি ভাই যখন খেতে বসল তখন দেখলাম, তাদের মিলি মিলি ( Mili-Mili ) দেওয়া হয়েছে। তারা নিগ্রো প্রথায় হাত দিয়েই অল্প অল্প করে খাচ্ছে। যা খেল তা তাদের পক্ষে প্রচুর এবং তৃপ্তির সহিত খেয়েছে তা বেশ ভাল করেই বুঝলাম। খাবার পর তারা জাহাজের জলের কল খুলে জল খেল। বড় ছেলেটি একটা নিকৃষ্ট সিগারেট জাহাজের এক কোণে বসে গিয়ে ফুকতে লাগল। তারপর যখন সন্ধ্যা হল, নিগ্রো প্রথায় তারা শুয়ে পড়ল। তারা যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত তখন আমি কেবিনে এসে তাদেরই কথা আমার ডাইরীতে লিখলাম।

পরদিন প্রাতে প্রভাতী খানা খাবার পর আমি ছেলে দুটির সংগে কথা বলে জানলাম, তাদের মা নিগ্রো এবং পিতা বৃটিশ।

তারা যাচ্ছে নিকটস্থ একটি গ্রামে। সেখানে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুল আছে এবং সে স্কুলে থাকবার এবং খাবারের বন্দোবস্তও আছে। তাদের বাবা তাদের শিক্ষা এবং খাবার থাকবার প্রত্যেকের জন্য বৎসরে পঁচিশ পাউণ্ড করে দেন। ছুটিতে উভয়ে মিলে তাদের মা বাপকে দেখতে গিয়েছিল। ফিরে আসবার সময় তাদের বাবা ছেলেটিকে দশ শিলিং এবং ছোট ছেলেটিকে পাঁচ শিলিং দিয়েছিলেন। ছোট ছেলেটি পাঁচ শিলিং কোথায় হারিয়ে ফেলেছে সেজন্য ছোট ছেলেটি বড়ই দুঃখিত ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এই সামান্য অর্থ খরচ করে সারাটি বৎসর তারা মিঠাই কিনে খাবে। তাদের অবস্থা শুনে মনে হল, তাদের পিতা উপযুক্ত ব্যবস্থাই করেছেন। নিগ্রো স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলে কোনমতেই ইউরোপীয় ষ্টেটাস্ পেতে পারে না অতএব তাদের নিগ্রো আচার-ব্যবহার অভ্যাস করাই উচিত। বড় ছেলেটি আমাকে পরিষ্কার করে বলল, তার বড় ইচ্ছা ছিল ইউরোপ গিয়ে লেখাপড়া শিখে এবং ইউরোপে সে বাস করে, কিন্তু স্থানীয় আইন তাকে ইউরোপে বাস করবার অধিকার দিচ্ছে না, ইউরোপীয় জনগণও তাদের মত লোককে মানুষ বলে স্বীকার করতে রাজি নয়। এরূপ অবস্থায় সে তার ভবিষ্যৎ কর্ম জীবন এরই মাঝে স্থির করে নিয়েছে। আমি উৎসুক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তার সেই ভবিষ্যৎ কর্ম পদ্ধতিটী কি হবে? সে বলেছিল, "যদি বেঁচে থাকি তবে আফ্রিকার কালো জাতির যাতে উন্নতি হয় তারই জন্য জীবন নিবেদন করে রেখেছি। আমি নিগ্রোই আর কিছু নই। আমার ধর্ম নাই, আমার আর কোন কাজ নাই শুধু নিগ্রোদের মানুষ করা হবে আমার কর্ম জীবন।" উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা পূর্ণ কথায় আমার

বেশ আনন্দ হয়েছিল, আর মনে হয়েছিল ভারতের এংলো ইণ্ডিয়ানদের কথা। তারপরই মনে হয়েছিল আমাদের সমাজের কথা। আমরা অপরকে গ্রহণ করার পরিবর্তে বর্জনই করি এবং সেজন্যই এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। নিগ্রোরা এইরূপ বর্জন নীতি শিখেনি। ভবিষ্যতে শিখবেও না কারণ নিগ্রোরা এরই মাঝে সময়ের সংগে পা ফেলে চলতে শিখছে।

দিন যায় রাত হয়, জাহাজ ক্রমাগত চলে। আমার কোন কাজই ছিল না। জাহাজের কেপ্টেন আমার সংগে কথা একদিনই বলেছিলেন তারপর আমার সংগে দেখা করার প্রবৃত্তি একেবারেই বোধ হয় লোপ পেয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে সকল বৃটিশ মজুর বুঝতে পারে তারা অপরকে মুখ দেখাতেও লজ্জা বোধ করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদে এমন অনেক কলংক আছে যার কথা কেউ মুখেও আনতে চায় না।

চতুর্থ দিন বিকাল বেলা জাহাজখানা বাঁ দিকে একটি গ্রামের কাছে এসে ভিড়ল। কেপ্টেন দৌড়ে এসে আমাকে বললেন গ্রামখানা দেখে আসবেন এবং গ্রামের কাছে যে ধ্বংস স্তুপটি রয়েছে তার সম্বন্ধে আপনার কি মত তাও আমাকে বলবেন। আমি কেপ্টেনের কথায় রাজি হলাম এবং তৎক্ষণাৎ মোল্লার সংগে হ্রদের তীরে অবতরণ করলাম। হ্রদের তীরে বেয়ে একটি ছোট পথ গ্রামেতে চলে গিয়েছে। আমরাও সেই পথ ধরেই চললাম। মোল্লা চলেছিলেন মুরগীর অন্বেষণে আর আমি চলেছিলাম ধংস স্তূপটি দেখতে।

পথের দুপাশে ছোট বড় বৃক্ষ। বৃক্ষগুলি দেখলেই মনে হয় এখানে ট্রপিকেল আবহাওয়া যদিও বর্তমান তবুও বাংলার ট্রপিকেল আবহাওয়ার মাঝে যে প্রকারের বৃক্ষ, লতা এবং উদ্ভিদ হয় এখানে তার নাম গন্ধও নাই। প্রত্যেকটি গাছের চামড়া মসৃণ। পাতাগুলি পুরু। গ্রামে গিয়ে

মনে হল উত্তর বংগের কোনও হতশ্রী গ্রামে এসেছি। লোকজন অতি অল্প। লোকের মাঝে যেন প্রাণ নাই। তারাও উত্তর বংগের গৃহস্থদের মতই ঘর তৈরী করে তাতে বাস করছে। স্ত্রী পুরুষ সবাই ধুতির মতই এক টুকরা কাপড় কোমরে জড়িয়ে রেখেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গ্রামের ঘর বাসন এবং লোকের আচার ব্যবহার দেখে মনে হল বাংলা দেশের কোথাও পাইচারী করছি। কিন্তু একটা কথা এখানে আমাকে বলতেই হবে, সেই কথাটি হল বাংলার দরিদ্র লোকের সংগে এখানকার নিগ্রোদের বেশ মিল আছে। নিগ্রোরা অসভ্য বর্বর, তাদের সম্বন্ধে অনেক বাজে কথায় পূর্ণ বই বের হয়েছে আর বাংলার দরিদ্র চাষাদের সম্বন্ধে সেরূপ বই বের হয়নি। দরিদ্র বাংগালী যেমন নিরক্ষর এরাও তেমনি নিরক্ষর। প্রভেদটা কিন্তু আমার চোখে খুব কমই পড়ল। এরাও যেমন প্রিমিটিভ ষ্টেজে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা যায়। এরাও লম্বা একটা কাপড় যার নাম আমি জানিনা তাকে জাতীয় পোষাক বলে আর আমরা ধুতিকে জাতীয় পোষাক বলি। আমাদের সংগে ওদের যেমনতর প্রভেদই থাকুক না কেন তাদের দেশকে বাংলা দেশের মতই মনে হচ্ছিল।

মোল্লার মুরগী কেনা হয়ে গেছে। মোল্লা চলে গেলেন জাহাজে আর আমি চললাম একটি গভীর জংগলে। জংগলে চলেছিলাম আমি একা। যে পথ দিয়ে চলেছিলাম সেই পথে পেতেছিলাম পুরাতন ইট আর পাটকেল। আমি ইট হাতে নিয়ে তাই পরীক্ষা করতেছিলাম। সিমেটিক অর্থাৎ আরব, জু, সিথিয়ান যে রকম ইট প্রস্তুত করে এই ইট সে রকমের নয়। স্লাভ, সেকৃশন, রোমান, গ্রীক, ইরাণী, আর্য্যাবর্তবাসী ধরণের যে ইট পুরাতন যুগে ব্যবহার করত এই ইটের সংগে তার কোন

সম্বন্ধ নাই। ইটগুলি ঠিক চারকুনে নয় একটু তেড়া হয়ে চারকুনে হয়েছে। তারপর হাতের কাছেই পেতে লাগলাম কতকগুলি পাটকেল। দু'তিন খানা পাটকেল একত্র যোগ দিয়ে দেখলাম হয়েছে একখানা ত্রিভুজ। এরূপ ত্রিভুজযুক্ত একখানা ইট পাই কিনা তাই খুঁজতে খুঁজতে পথে চললাম। কতক্ষণ গিয়ে একটা ইটের স্তূপ পেলাম, সেই স্তূপে সবই ত্রিভুজ ইট। আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। মনের কোণে তখন পুরাতন সভ্যতার কথা ক্রমাগত আসছিল। ভুলে গিয়েছিলাম আমার বাড়ি ঘর, ভুলে গিয়েছিলাম আমার জাতের কথা। আমি যেন হয়ে গিয়েছিলাম একজন সভ্য বিশ্বমানবের।

জাতীয়ভাব বড়ই খারাপ। নিজের জাতের সংগে এর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাই হয়ে যায় প্রতিপাদ্য বিষয়। বর্তমানের রুশদেশের কমিউনিষ্টরাই নিরপেক্ষতা বজায় রেখে অন্যের সম্বন্ধে কিছু বলতে সক্ষম হয় নতুবা প্রত্যেক জাতের লোকই নিজের জাতীয় গৌরব বাড়াতে গিয়ে আবোল তাবোল বকে। ঐ যে মঠটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইচ্ছা করলেই আমি ভারতের যে কোন সভ্যতার সংগে খাপ খাইয়ে দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার অংশে মিশিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা হতে পারে না। আমাদের পুরাতন সভ্যতা সম্বলিত ইমারতের অভাব নাই তাই অপরের কিছু চুরি করে নিজস্ব করার দরকার নাই।

স্তূপটি অনেক পুরাতন। দূর হতে প্রথম মনে হয় এটা একটি হিন্দুর মঠ, কাছে গেলে মনে হয় এটা একটি আরবের দুর্গ। দেওয়াল উঁচু; মঠের আরও কাছে গেলে মনে হয় এই মঠটি এদুয়ের কিছুই নয়, অন্য আর কিছু, যার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোন মন্তব্য করেন নি। আমি মন্তব্য করতে ভয় পাচ্ছি না তবে অতি চিক্কণ গলায় বলব এটা দ্রাবীড় সভ্যতার একটি অংশ। দ্রাবীড় নানা রকমের। ভারতের দ্রাবীড়ের

সংগে এই মঠের কোন সম্বন্ধ নাই। আমার যতদূর মনে হয় এরূপ মঠ ব্রহ্মদেশের নিম্ন-অন্চলে কম্বোজে এবং বেলচিস্থানের শেষ প্রান্তে যে সকলে দ্রাবীড় বাস করে তাদের অধ্যুষিত দেশে এরূপ কিছু দেখতে পাওয়া যায়। লোকমুখে শুনেছি দক্ষিণ আরবে যে সকল দ্রাবীড় বসবাস করে তাদের অধ্যুষিত অন্চলেও এরূপ মঠ অনেক আছে।

মঠের পাশে একস্থানে ইংলিশে লেখা ছিল "Can you find out any thing about it? বিদায়ের বেলা ইংলিশভাষায়ই লেখে রেখে এসেছিলাম yes, I can, My address is this—দেওয়া ঠিকানা মতে চিঠি এসেছিল কিন্তু স্তোলিশবারীর ( রডেসিয়া ) post-officeএ কর্তৃপক্ষ আমার মত লোকের চিঠি বেশিদিন রাখতে রাজি ছিলেন না, শুধু একখানা লিষ্ট দিয়েছিলেন কোথা হতে কি চিঠি এসেছিল। রডেসিয়া সরকার আমাকে মানুষের পর্যায়েই আনেন নি তাই আমার চিঠি তাদের চিঠির থলিতে স্থান দিতেও অসমর্থ হয়েছিলেন। রডো-সিয়ার শ্বেতকায়রা বাস্তবিকই দুর্জন।

জাহাজে ফিরে আসার পরই কেপটেন আমার সংগে দেখা করলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম এই স্তুপ বর্তমান সভ্যতার বহুপূর্বের। এই নিয়ে যদি গবেষণা করতে হয় তবে অনেক কিছু জানার দরকার। উপরন্তু একদম নিরপেক্ষ হওয়াও কর্তব্যের মাঝেই গণ্য, শুধু জাতীয় ভাবে অন্ধ হয়ে থেকে আবোল তাবোল বললে চলবে না। সেদিন রাত্রে কেপটেন আমার সংগে অনেক কথা বলে গভীর রাত্রে বিদায় দিয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রে জাহাজ একটুও নড়েনি। এখান হতে অনেক মাল পোর্ট জনষ্টন যাবে। মাল প্রস্তুতই ছিল কিন্তু মাল উঠাবার মজুর ছিল না। এখানে মজুরগণ রাত্রে কোন কাজই করে না। স্থানীয়

লোক মনে করে রাতে ঘুমাতে হয় আর দিনে কাজ করতে হয়। এখনও পুরাতনযুগের নিয়ম ভেংগে কেউ কাজ করতে আসে না। জাহাজ কোম্পানীও স্থানীয় লোকের পুরাতন নিয়মকানুন নষ্ট করতে একেবারেই নারাজ। এই নিয়মই বজায় রাখতে গিয়ে জাহাজ কোম্পানী স্থানীয় লোককে কোনরূপ শিক্ষায়ই ব্রতী করতে চায় না এটাই হলো গোপনীয় কথা। কিন্তু এরূপ করে অশিক্ষিতদের ঘুমিয়ে রাখা সভ্য সমাজের লোকের পক্ষে নিন্দার কথা। সাম্রাজ্যবাদ নিন্দাকে ভয় করে না এবং কখন ভয় করেওনি। অতএব এবিষয়ে আর বেশীকথা বলে লাভ নাই।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি কতকগুলি মজুর জাহাজে এসে নীরবে শুয়ে আছে। এতগুলি লোক কখন জাহাজে উঠল এবং একটুও শব্দ না করে শুয়ে পড়ল তা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের দেশে দশজন লোক একত্রিত হলেই হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। সংবাদ নিয়ে অবগত হলাম স্থানীয় মিশনারীরা ওদের শিখিয়েছে কি করে লাইন হয়ে দাঁড়াতে হয় তারপর কি করে অন্য কারো অনিষ্ট না করে জাহাজে গিয়ে বসতে হয়। মানুষের স্বাস্থ্য ঘুমেই ফিরিয়ে আনে। নিজের অসাবধানতা বশত অন্যের ঘুম ভাংগা ভয়ানক অন্যায় কাজ। মিশনারীরা নিগ্রোদের উন্নত ধরণের কৃষ্টিগত শিক্ষার দিক দিয়ে সাহায্য করছেন দেখে তাদের কাছে নিগ্রোরা যেমন কৃতজ্ঞ আমিও তেমনি কৃতজ্ঞ। আমি চাই মানব জাতের উন্নতি। ভারতবাসীরা অহংকার করে বলে তারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বলীয়ান, কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীদের সংশিক্ষার সামান্যকিছু হিন্দুসমাজ পেলেও অনেক আগিয়ে যেতে পারত।

নিগ্রো রমণীরা স্বাধীন। তারা এখনও পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে না। যে যে স্থানে আরব সভ্যতার প্রবেশ লাভ করেছে

সেখানে স্ত্রীজাতীর স্বাধীনতা অনেকটা লোপ পেয়েছে। যেখানে এখনও নরডিক নিয়ম বজায় রয়েছে সেখানেই এখনও স্ত্রী স্বাধীনতা বর্ত্তমান। এখানকার স্ত্রীলোক স্বামীর বর্তমানে যে কোন পুরুষকে কয়েক দিনের জন্য স্বামী করে নিতে পারে। এবিষয়ে চিরস্থায়ী স্বামীর আপত্তি করার কিছুই থাকে না, অথবা যদি চিরস্থায়ী স্বামীকে গৃহত্যাগ করতেও হয় তবে কারো কিছু বলার থাকে না। জাহাজে সেরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি একটি লোক কয়েকটী ছেলে মেয়ে নিয়ে একত্রে বসে আছে আর তারই স্ত্রী অন্য একজন পুরুষের সংগে বসে ধীরে এবং আনন্দে কথা বলছে। আমার চক্ষে হয়ত সেই দৃশ্যটি মোটেই আসত না কিন্তু কংকনী ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে বললেন এদের মাঝে কয়েক দিনের জন্য বিয়ে হয়ে গেছে আর ঐ দেখুন স্ত্রীলোকটীর পূর্বের স্বামী অন্যত্র বসে আছে। আমার কাছে এই ঘটনাটি নতুন নয় এবং মনেও বাধেনি। আমি পৃথিবীর নতুন এবং পুরাতন উভয় প্রথাকেই সমান ভাবে গ্রহণ করতে পারি, কারণ আমার সামাজিক জীবনের আওতায় আসতে তখনও সুযোগ হয়ে উঠেনি। সামাজিক জীবনে আসলে পরেই সমাজকে চেনা যায় নতুবা কিছুই বুঝা যায় না।

আফ্রিকার অন্তস্থল কত সুন্দর এশিয়াবাসী এখনও জানবার চেষ্টা করেনি। এশিয়াবাসী ব্যবসা বাণিজ্য করতে আফ্রিকায় যায়, মোটা টাকা অর্জন করে দেশে ফিরে আসে কিন্তু আফ্রিকা কি রকম দেশ সে সংবাদটি স্বজনের কাছেও বলতে রাজি হয় না। মতলবের এটাই চরম দৃষ্টান্ত। ন্যাসা হ্রদের চারিদিকের উর্ব্বরা ভূমি, নিরীহ অধিবাসী, হ্রদের নানারূপ মৎস্য, এসব বাস্তবিকই লোভনীয়। কোতা-কোতা ( Kota-Kota ) বন্দরটি দেখামাত্র পথিকের মনে একটি শান্তির স্নিগ্ধতা আসে। আরবগণ এখানে সর্বপ্রথম আসে

এবং বন্দরের কাছেই একটি দুর্গ তৈরী করে। আরবগণ দুর্গকে কোতা বলে। আরবগণ দুর্গ তৈরী করতে বেশি পরিশ্রম করেনি কারণ নিকটস্থ ধংস স্তূপ হতে তারা বিস্তর পাথর সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

জাহাজখানা বন্দরে ভিড়ামাত্র অনেকগুলি যাত্রী নামতে লাগল। আমার পরিচিত ছেলে দুটিও নামবার পূর্বে আমার সংগে দেখা করল। বড় ছেলেটিকে মন দিয়ে লেখাপড়া করে একটু বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন করতে বল্লাম এবং আরও বল্লাম, বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করার পর সে যেন নিগ্রো জাতের উন্নতির চেষ্টা করে। আমার কথা শুনে ছেলে দুটি বিনীতভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তাদের বিদায় দিয়ে আমি জাহাজের উপরের ডেকে উঠে নিকটস্থ দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম।

আমার সামনে সদ্য স্নাত বৃক্ষরাজি অরুণ সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল। সুন্দর ভূমি হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঢেউ খেলে পর্বতের গায়ে মিশছিল। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর নিগ্রো গ্রাম। গ্রাম দেখার জন্য বড়ই ইচ্ছা হল। চটপট করে জাহাজ থেকে নেমে গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম। গ্রামের দিকে যে পথ গিয়েছে তা সোজা এবং চিক্কণ। গ্রামের গড়ন সভ্য ধরণেই হয়েছে। গ্রামের কাছেই দুটি ভারতীয়দের দোকানের সামনে যে পথটি তা বেঁকা হয়ে এসে আবার বেঁকিয়ে সরল পথে গিয়ে মিশেছে। ভারতীয় প্রকৃতিই যেন অসরল তাই তাদের বাড়ির সামনের পথটাও বেঁকা। গ্রামে গিয়ে দেখলাম দুদিকে সারি দিয়ে ঘর। প্রত্যেকখানা ঘরই যেন পথকে সম্মান দেখাবার জন্য পথের দিকে মাথা নত করে আছে। পথ পরিষ্কার। গ্রামের যত ময়লা, ঘরের

পেছনে ফেলা ছিল। আমরা কিন্তু তার বিপরীত কাজ করি। যত ময়লা সবই পথে এনে ফেলে দিয়ে মনে করি আমার ঘর পরিষ্কার থাকলেই হল, পথের লোক পথে চলতে পারল না পারল তাতে আমার বয়ে গেল। কিন্তু এখনও আমাদের জ্ঞান হয়নি পথের ময়লা পথচারীর পায়ে করে যখন আমাদের ঘরে আসবে তখন আমরাই যে মরব। নিগ্রোরা সে কথাটা আমাদের চেয়ে অসভ্য হয়েও আমাদের আগেই বুঝেছে বলে তাদের তৈরী পথে কোন রোগ জন্ম নিতে পারে না। গ্রামটি দেখেই দৌড়ে আবার জাহাজে এসে উঠলাম। একটু দৌড়াতেই আমাকে হাপাতে হয়েছিল দেখে চিন্তা হল আমি আমার বাকী ভ্রমণ কি করে সমাপ্ত করব ?

এদিকে আরবদের প্রাধান্য এবং অত্যাচার হয়েছিল বলে অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার হয়েছে এবং হবেও তা বলে আপসোস করে কোন লাভ নাই। যাতে করে সকলেই সমান হতে পারে তার উপায় নির্ধারণ করে কাজে লেগে যাওয়াই হল প্রকৃষ্ট উপায়।

জাহাজ এর পর সালিমাতে আসল এবং সালিমাতে যে সকল নিগ্রো জাহাজে উঠল তাদের দেখে আমার বেশ আনন্দ হল। এরা একটু শিক্ষিত এবং এদের পোষাকও ভাল। এদের সংগে কথা বলেই সারাটা দিন কাটিয়ে দিলাম। প্রাতে ছোট জাহাজখানা পোর্ট জনষ্টনে ( Johnston ) এসে লাগল।

পোর্ট জ্যনষ্টন ন্যাসা হ্রদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি বন্দর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর। ছোট ছোট জেটি করা হয়েছে তাতে মিষ্টি জলের ঢেউ অনবরত এসে লাগে। হ্রদের জল স্বচ্ছ থাকায় দশ হাত জলের নীচে মাছগুলির চলাফেরাও দেখা যায়। জাহাজখানা

ডকে লাগবার পর থেকেই আমি মাছের খেলা মন দিয়ে দেখছিলাম। এদিকে নিগ্রোযাত্রীরা তাড়াতাড়ি করে জাহাজ হতে নেমে পড়ল। কেউ তাদের একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না। সমুদ্র-তীরের বন্দরগুলিতে ডেক প্যাসেন্‌জারদের উপর অত্যাচার হয় বেশি। এখানে তার বিপরীত। নিগ্রোরা জাহাজ হতে নেমে যাওয়ার পর একজন বৃটিশ অফিসার এসে বিদেশী যাত্রীদের পাশপোর্ট দেখতে লাগলেন। বিদেশী যাত্রীদের মধ্যে একজন ইউরোপীয়ানও ছিলেন। সেই লোকটি কাস্টম অফিসারকে সুপ্রভাত বলামাত্র অফিসারও তাঁকে সুপ্রভাত বলে করমর্দন করলেন। তারপর পাসপোর্ট শিল মোহর করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

আমার মনে হল লোকটি জার্মান হবে। জার্মানরা বৃটিশের অনেক দিনের শত্রু। কিন্তু বৃটিশ অফিসার যেভাবে তার সংগে সংব্যবহার করলেন তাতে বুঝলাম "বৃটিশ" শক্তিশালী শত্রুর সংগে সংব্যবহার করে। তারপরই আমাদের পালা। আমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করতে দেরী হল না কারণ আমি এদেশে থাকতে আসিনি। উপরন্তু আমার সংগে পর্তুগীজ্ পূর্ব আফ্রিকায় প্রবেশেরও আদেশপত্র ছিল। আমারই সংগের অন্য তিন জন ভারতবসীকে বৃটিশ অফিসার নানারূপ প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। অবশেষে তাদেরও ন্যাসাল্যাণ্ডে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। এদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের প্রজা না হলে, শত্রু হলেও, বন্ধু হওয়া যায়। প্রজা হলে শুধু পদাঘাতই খেতে হয়।

তীরে অবতরণ করে আমি লছমন নামীয় একজন লরী ড্রাইভারের ঘরের খোঁজ করতে লাগলাম। অতি অল্প সময়ের মাঝেই

তাঁর ঘরে গিয়ে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাঁর ঘরখানা বেশ ছোট। ঘরের বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার পাতা ছিল, তাতেই বসলাম।

লছমনের অর্দ্ধ নিগ্রো স্ত্রী ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হাতের কাজ সমাপ্ত করে বাইরে আসা মাত্র আমি তাঁকে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করছিলাম। এতে তিনি বড়ই সুখী হয়েছিলেন। লছমনের স্ত্রী আশা করেননি তাঁকে আমি ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করব। আমার ভারতীয় প্রথায় নমস্কার পেয়ে লছমনের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করছিলেন "আপনি কি মিঃ লছমনের কেউ হন্?" আমি তাঁকে বলছিলাম "আমি তার স্বদেশবাসী তার বয়স আমার চেয়ে বেশি। অতএব বড় ভাইএর স্ত্রী দেশে যে সম্মান পেয়ে থাকেন আপনি তাই আমার কাছ থেকে পেয়েছেন।" আমার কথা শুনে লছমনের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়ে স্নানের জলের ব্যবস্থা করে ফের বাইরে এসে বললেন, "আপনি স্নান করুন, গরম জলের ব্যবস্থা হয়েছে

আমি যখন স্নান করছিলাম তখন ভাবছিলাম এই সামান্য একটি নমস্কার, তারই এত সুফল! যদি আমাদের ভেতর নানারূপ কদর্য জাতিভেদ না থাকত এবং বিদেশীদের সমাজে গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকত তবে আমাদের সমাজের কত উন্নতি হ'ত? ঠিক করে নিলাম এ জীবনে জাতিভেদ আর মানব না।

ন্যাসা লেইক ( Nyasa Lake ) আফ্রিকার অন্তস্থলে অবস্থিত। জাহাজে করে লেকটি পেরিয়ে এসেছি, এখন তার দক্ষিণ তীরবর্তী স্থানগুলি আমাকে ভাল করে দেখতে হবে এই বাসনা নিয়েই পোর্ট জ্যনস্টনে আসা। আফ্রিকা সম্বন্ধে যাঁরা গল্প লেখেন তাঁদের গল্পের আরম্ভ হবার স্থান এখান থেকেই। কারণ ন্যাসা লেকের

চারি পাশে ঘন বন এবং উপবন রয়েছে। সেই বন এবং উপবন-গুলিতে বিশেষ কোনও বন্যজীব নাই অথচ ন্যাসা লেকের পূর্বতীরে নানারূপ ধ্বংস স্তূপ রয়েছে, যার ঐতিহাসিক তথ্য জানা এবং তাই জেনে জগতবাসীকে জানানো, এই কঠোর কাজে আজ পর্যন্ত কেউ অগ্রসর হননি। আমার ইচ্ছা হল এই সম্বন্ধেই কিছু জানাব। এবং অন্তত পক্ষে ভারতবাসীকে জানাতে চেষ্টা করব। কিন্তু তা জানতে হলে ছোট ছোট ধ্বংস স্তূপকে পরিত্যাগ করে প্রসিদ্ধ ধ্বংস স্তূপের কাছে যাওয়াই ভাল। এই ঠিক করে আমি পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। পথ রেলগাড়ীর নয়, পায়ে হাঁটা পথ। আমার গন্তব্যস্থানে পৌছতে তিনটি মাস লেগেছিল। অনেকেই ভাববেন হয়ত আমি পথে ক্রমাগত চলছিলাম, হয়ত আমি লোকালয়ের সন্ধান কমই পাচ্ছিলাম। হয়ত আমার অর্থের কোন দরকার হয়নি। মনে রাখতে হবে আফ্রিকাতে ভারতীয় সন্ন্যাসীরাও যেতে ভয় পায়। সেখানে গংগানদী নেই, জনপদ নেই, অথবা স্বর্গে যাবার জন্য কেউ অন্নছত্রও খুলে বসেনি। সুখের বিষয় সেখানকার লোক এখনও অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীদের নামও শোনেনি। এমনি দেশে ভ্রমণ করাটা বাস্তবিকই একটু কষ্টকর। প্রচুর টাকার দরকার হয়।

লছমন সেদিন ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী আমাকে কিছু খাইয়ে নিকটস্থ একটি ভদ্রলোকের কর্ম্মচারীদের থাকবার ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সারাটি দিন ঘুমিয়েই কাটিয়েছিলাম। বিকাল-বেলা স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগে মামুলীভাবে কথা হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে অনেকেই কলকাতার একখানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার কথা বলছিলেন। এই পত্রিকার

আফ্রিকাতে অবাধগতি ছিল অথচ বঙ্গে ক্রনিকল, হিন্দু, অমৃতবাজার পত্রিকা এদের সকল সংখ্যা নিয়মিতভাবে পাওয়া যেত না। আমি তাদের এসম্বন্ধে কিছুই বলিনি তবুও তারা বলতে ছিলেন, "এদেশে হিন্দু মুসলমান বলে কোন প্রশ্নই নাই, যদি এ প্রশ্ন এদেশে জাগে তবে আমরাই মরব। আরবগণ কখনও নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না, নিগ্রো নিগ্রোই, তাদের ধর্ম নিয়ে কোনও বলাই নাই। নিগ্রোদের এখন থেকেই নানারূপ মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এদেশে যত ভারতবাসী এসেছে তারা নাকি সকলেই "ইণ্ডিয়ান ইহুদী," দেশে স্থান পায় না বলেই আফ্রিকাতে এসেছে। এদের দুঃখের কথা শুনে আমার একটুও দুঃখ হ'ল না, কারণ এরা বিদেশে এসেও তাদের মনকে উন্নত করে তাদের কৃষ্টির উন্নতি করতে সক্ষম হয়নি। ঘরে বাইরে সর্বত্র থু থু ফেলা, বর্তমান সময় উপযোগী পোষাক না পরা, এসব যেন এদের ধাতে সয় না। তারই ফলে নিগ্রোরাও এদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে।

পরদিন সকাল বেলা লছমন এসেই আমাকে ডাকলেন এবং গ্রামের লোকের কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন, "আপনাদের ভালমন্দ এঁর কাছে বলুন ইনি আপনাদের সাহায্য করতে পারবেন। ধর্ম নিয়ে যে সকল সংবাদপত্র বেশি কথা বলে তাতে অনেক রিপোর্ট পাঠিয়েছেন" কিন্তু একটি সংবাদও সেই সংবাদপত্র ছাপেনি। এসব ধর্মভীরু ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠের ফলে আমাদের মধ্যে শুধু ভাংগনই ধরবে, একত্রিত হয়ে সমাজের উন্নতি করতে পারব না।". লছমনের কথার অর্থ সকলেই ভাল করে বুঝলেন।

বঙ্গের একখানা পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে বেশ দুকলম লিখে-

ছিলেন, সেই লেখার জন্য ন্যাসালেণ্ডে পর্যন্ত বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এক জন ভূপর্যটককে অনর্থক আক্রমণ করা সেই পত্রিকার পক্ষে অশোভনীয় বলেও মিঃ লছমন বলতে ভুলেননি। সেই পত্রিকা কেন আমার প্রতি অসদয় হয়েছিলেন তা বলা এখানে অন্যায় হবে না। কলিকাতার হিন্দুস্থান-স্ট্যাণ্ডার্ডের মারফতে আমি বলেছিলাম, "বিদেশে ভারতীয় মুসলমানও বন্দেমাতরম শব্দ ব্যবহার করে।" এতে "সেই পত্রিকার" গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই পত্রিকার সম্পাদক জানতেন না, যারা বন্দেমাতরম বলে চিৎকার করছিল সেই ভারতীয় মুসলমানদের মনের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল। এরূপ পত্রিকার মতবাদীদের এক জনেরও সে অবস্থা হয়নি এবং ভবিষ্যতে হবারও কোন আশা নাই। অল্পের মধ্যেই কথাটা সারতে হল কারণ ভ্রমণকাহিনীতে বাস্তব রাষ্ট্রনীতির ( Active Politics ) স্থান থাকে না।

দক্ষিণ ন্যাসাল্যাণ্ড পর্বতময়। এখানে সাইকেল নিয়ে চলাফেরা করা আর নিজকে মেরে ফেলা একই কথা। আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পৃথিবী ভ্রমণে বের হইনি। দেখবার এবং জানবার জন্যই বের হয়েছিলাম। লছমনও পথের দুর্গমতা অনুভব করে ছাব্বিশ মাইল পথ আমাকে মোটরে নিয়ে যেতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। পরের দিন আমরা রওয়ানা হয়ে বিকালবেলা, ছাব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হই এবং লছমনের বৈবাহিক সূত্রে নিকটস্থ আত্মীয় মোহাম্মদের বাড়িতে আশ্রয় নেই। গ্রামের নাম বালাকাস ( Balakas )। গ্রামের যেমন ইতিহাস আছে তেমনই করে এই গ্রামের বাসিন্দার কথাও বলবার রয়েছে।

আফ্রিকার অন্তস্থল ন্যাসাল্যাণ্ড বৃটিশ তত সহজে দখল করতে

সক্ষম হননি। ন্যাসাল্যাণ্ড দখল করতে ভারতীয় সেপাইদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। বর্তমানে ন্যাসাল্যাণ্ড একটি রক্ষিত দেশ। বৃটিশই এখানে সর্বময় কর্তা। প্রকৃতপক্ষে দেশটি শাসিত হয় একজন রেসিডেণ্ট দ্বারা। এখানে নিগ্রোদের প্রতি অনর্থক অত্যাচার করা হয় না। নিগ্রোরা এখানে রাত্রে ডিজ্ বাতি জ্বালিয়ে পথ চলে বটে তবে শহরেও থাকতে পারে। ইউরোপীয়ানদের বাড়ীতে প্রকাশ্যেই নিগ্রো বয় এবং কুক রাত্রিবাস করতে পারে। এতগুলি সংবাদ আমাকে এক জন ভারতীয় দিয়েই বললেন, ইউরোপীয়ানদের চরিত্র দোষ থাকার জন্যই এরূপভাবে নিগ্রোদের রাত্রে শহরে থাকতে দেওয়া হয়। বক্তার ইংগিত হল, নিগ্রোদের শহরে বাস করতে না দেওয়াই উচিত। যারা গোলাম হয়ে জন্ম গ্রহণকরে তাদের গোলামীভাব স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই যেতে পারে না।

যার বাড়ীতে রাত কাটাবার জন্য আসলাম তাঁর নাম পূর্বেই বলেছি। ইনি ধর্মে সুন্নি, এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান যারা এখানে বাস করে তারা সকলেই হল সিয়া। সিয়াগণ নিগ্রোরমণীর পানিগ্রহণ কোন মতেই করে না এবং যে সকল ভারতীয় নিগ্রোরমণীর পানি-গ্রহণ করে তাদের সমাজ হতে তাড়িয়ে দেয়। সমাজ হতে বিতাড়িত হওয়া কত কষ্টের তা সকলে অনুভব করতে পারে না, যারা তাড়িত হয় তারাই সে কষ্ট বোঝে।

ন্যাসা-লেকের জাহাজে অন্য আর এক জন লোকের আতিথ্য আমি গ্রহণ করেছিলাম। তিনিও ভারতীয় মুসলমান, তিনি জাহাজ হতে উঠেই নিজের ঘরে গিয়ে স্নানাহার করে বিশ্রাম করার পরই লছমনের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর মুখের হাবভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি তার কোনও নিকটস্থ আত্মীয়ের বাড়িতে

এসেছিলেন এবং সে হিসাবেই ঘরের ভেতর চলাফেরা করছিলেন, লছমনের স্ত্রীও মিঃ ও মিসেস্ আলীকে নিকটস্থ আত্মীয়ের মত গ্রহণ ক'রে, গোপনে রক্ষিত নানারূপ পিঠা এবং ফল খেতে দিয়েছিলেন। লছমনেরও সেই অবস্থা। ঘরে ফিরে এসেই স্ত্রীকে নিয়ে আলীর ঘরে খেয়ে, আলীর বিছানায় একটু শুয়ে তার পর আমার সংগে দেখা করেছিলেন। বাল্যকাসে আসার পরও লছমন মহাম্মদের অন্দরমহলে গিয়েছিলেন। মহাম্মদের স্ত্রীর সংগে কথা বলে খাবারের বন্দোবস্ত করে বাইরে এসে বসছিলেন। লছমনকে পেয়ে মহাম্মদের ছেলেদের কি আনন্দ! এদের জন্য লছমন পিঠা নিয়ে এসেছিলেন। মোহাম্মদ তখন ঘরে ছিলেন না।

খাবার খেয়ে আমরা বিশ্রামার্থ, মস্তবড় একটা ঘরে গিয়ে দেখলাম সেখানে সারি দিয়ে চারপাইয়ের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা সজ্জিত রয়েছে। শোয়া মাত্রই ঘুম আসল। ঘুমাবার পূর্বে ভেবেছিলাম এরূপ হয় কেন? কেন এক জাতের লোক অন্য জাতের লোকের সংগে মিশতে চায় না। যারা ভিন্ন জাতের লোকের সংগে মেশে তাদের মন এত উদার হয় কেন?

সন্ধ্যার পর মহাম্মদ ফিরে এসে যখন শুনলেন আমরা এসেছি তখন তাঁর আনন্দ এত হয়েছিল যে দৌড়ে এসে আমাদের ঘরে উপস্থিত হলেন এবং আমাদের ডেকে উঠালেন। ঘুম থেকে ওঠার পর মিঃ মহাম্মদ আমার সংগে বার বার করমর্দন করে বললেন—"ভাই শুনলাম তুমিও আমাদেরই একজন, এখানে তোমাকে কয়েক দিন থাকতে হবে।" আমি ভদ্রলোকের কথায় রাজি হলাম এবং মিঃ লছমনকে বললাম—"এখান হতে সাইকেলে করে আমি জুম্বা যেতে পারব, সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করবেন।" লছমন বললেন—"জুম্বাতে

আপনি মিঃ দাসের বাসায় থাকবেন। আমি তার ব্যবস্থা করে যাব।" তার পর রাছমমকে নিয়ে মহাম্মদ পথে বেরিয়ে পড়লেন। তারা পথে বেরিয়ে যে পরামর্শ করেছিলেন তা আমি পরে জেনেছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম হিন্দুরা বহু পূর্বেই নন্-কো-অপারেশন্ শিক্ষা করেছিল এবং তারই ফলে আজ হিন্দুর সমূহ ক্ষতি হচ্ছে।

মিঃ মোহাম্মদ চেয়েছিলেন আমার আসার উপলক্ষে তার ঘরেই গ্রামের সকল ভারতবাসীকে নিয়ে একটি জলসা করেন। সেই জলসা করার জন্য তিনি পঁচিশ পাউণ্ড খরচ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন কিন্তু গ্রামের অন্যান্য ভারতবাসী তাঁর বাড়ীতে সে জলসায় আসতে চাইল না। এতে তাঁর মনে ভীষণ বেদনা হয়। যে টাকা জলসা করবার জন্য দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন ক্ষুণ্ণ মনে সেই টাকা তিনি আমাকে দিয়ে বললেন, "মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমানে নন-কো-অপারেশন বলে নতুন একটি শব্দের সৃষ্টি করেছেন মাত্র কিন্তু নন-কো-অপারেশন হিন্দুদের মধ্যে যে বহু আগে থেকেই ছিল আজ আপনি স্বচক্ষেই তা দেখতে পেলেন।" মিঃ মোহাম্মদের দুঃখ দেখা আমার আর সইল না, তাই পরদিন সকলেই জুম্বার দিকে রওনা হলাম।

পথ পার্বত্য, দুদিকে অভ্রভেদী পর্বতমালা দাঁড়িয়ে ছিল। পথে পথচারী ছিল না। মাঝে মাঝে দু' একটি হনুমান বাঁদরের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিল, হনুমান বাঁদরগুলি যদিও দেখতে প্রকাণ্ড তবু তারা মানুষকে বড় ভয় করে। আমাকে দেখামাত্রই বাঁদরগুলি পথ ছেড়ে পার্বত্য জংগলে আশ্রয় নিতে লাগল। এরূপ পার্বত্য পথে একাকী ভ্রমণ করতে আনন্দ আছে বটে কিন্তু যদি বন্য জীব আক্রমণ করে তবে রেহাই পাওয়া কষ্টকর। লোক মুখে শুনেছি মাঝে মাঝে নিগ্রো পথিক বন্যজীবকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়; কিন্তু আমাদের মত

পদচারীর পক্ষে এরূপ ভয়কে মনে স্থান দেওয়া নিতান্ত অন্যায় ভেবেই পথ চলেছিলাম। পথে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটেনি; বেলা ১২টায় জুম্বা শহরে পৌঁছে এবং কলকাতানিবাসী মিঃ দাসের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করি।

কলকাতানিবাসী মিঃ দাসের পুরা নাম হল মহেন্দ্রনাথ দাস। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কোন বিশেষ পরিচয় যেন আমি আমার ভ্রমণকাহিনীতে না লিখি। মিঃ দাস এক নিগ্রো রমণীকে বিবাহ করেছেন এবং সে নিগ্রো রমণীর দিকে চারটি সন্তান হয়েছে। মিঃ দাস আমাকে পেয়ে বড়ই সুখী হয়েছিলেন এবং আমাকে তাঁর ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর নিগ্রো স্ত্রী বাংগালী মহিলাদের মতই পাক করতে পারতেন। তা বলে তিনি বাংগালী স্ত্রীলোকদের মত পর্দা প্রথা গ্রহণ করেন নি। মিঃ দাস চাইতেন তাঁর স্ত্রী পরদা মেনে চলুন; কিন্তু এই কুপ্রথা নিগ্রো মহিলা কোন মতেই সইতে পারতেন না বলে স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই কলহ হত। লক্ষ্য করে দেখলাম মিঃ দাসের অবহেলায় তাঁর পুত্রকন্যাগণ ভালভাবে সামাজিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। শুধু মিঃ দাসের ছেলেমেয়েরাই সেদিকে পশ্চাৎপদ নয়, অন্যান্য যে সকল ভারতবাসী নিগ্রো স্ত্রীলোক বিয়ে করেছেন তাঁরা প্রায়ই ছেলেপিলের প্রতি বিশেষ আগ্রহান্বিত নন।

যদিও জুম্বা ছোট একটি শহর তবুও এখানে অনেক ভারতবাসী নানা কাজকর্ম ক'রে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। এখানকার রেলওয়ে বিভাগে অনেক ভারতবাসী চাকরী করছেন। নিগ্রোরা স্টেশন মাষ্টার হতে পারে বটে কিন্তু ইউরোপীয়ান বা ইণ্ডিয়ানদের মত মাইনে পায় না। সেজন্য নিগ্রোরা বড় বেশী গোলও করে না, তারা সাধারণত অন্যভাবে এ জিনিসটাকে দেখে। ন্যাসাল্যাণ্ডের নিগ্রোরা আবেদন নিবেদনের

পক্ষপাতী নয়। তারা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে স্টেশন-মাষ্টার পদবীর পাঁচ পাউণ্ড বেতন হতে যদি ছয় পাউণ্ডে উঠে, তবে কোন লাভ হবে না, তারা চায় শ্রমিকে শ্রমিকে মাইনের দিক দিয়ে পার্থক্য উঠে যাক্ এবং যাতে ক্রমে সেই পার্থক্য উঠে যায় সেজন্য তারা রীতিমত পরিশ্রমও করছে। গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরতা যাতে লোপ পায় সেজন্য গোপনে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করছে। ন্যাসাল্যাণ্ডেও মিশনারীরাই হলেন শিক্ষার কর্ণধার। মিশনারীদের শিক্ষা মোটেই খারাপ নয় কিন্তু তাতে শিক্ষার চাহিদা মেটে না। যতগুলি ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখতে চায় ততগুলি ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ব্যবস্থা থাকতে পারে না, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাইনে দেবার পর আসল শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ করার মত উদ্বৃত্ত নিতান্ত তুচ্ছ। এদিকে বিদেশীদ্বারা কিংবা কোন ব্যবসায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষার প্রচার আইনবিরুদ্ধ, এরূপক্ষেত্রে গোপনে শিক্ষাপ্রচার ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

এখানকার নিগ্রোদের দেখলে মনে হয় এদের কোন রকম পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি ছিল। হয়ত তারা সেই পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি একেবারে ভুলে গিয়েছে। এক নিগ্রো কামারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কামারের কাজ তারা ইউরোপীয়দের কাছ থেকে শিখেছে কিনা। নিগ্রো আমাকে জবাব দিলে, "এটা ইউরোপীয়ান প্রথা নয়, এটা আমাদের নিজেদের প্রথা।" নিগ্রো কামারের দোকানের সংগে ভারতীয় কামারের দোকানের আগাগোড়া মিল আছে। সেই মান্ধাতার আমলের হাপর, হাতুড়ি ও বাটালি দেখলেই মনে হয় যেন ভারতীয় কোন কামারের দোকানে বসে আছি। ভারতের তাজমহল, বুদ্ধগয়া এবং তাঞ্জোরের মন্দির দেখে যদি কেউ তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ কোন গ্রামে যায় তবে সে

লোকটি বিশ্বাস করবে না এই নিকটস্থ গ্রামের পূর্বপুরুষরাই এত বড় স্থপতিবিদ্যার অধিকারী ছিল। ঠিক সেরূপ ন্যাসালেক্-এর পূর্ব তীরস্থিত পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখে কেউ মনে করবে না যে এই নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষই ছিল সেই ধ্বংসস্তূপের নির্মাতা।

আরবী ভাষায় একটী কথা আছে যাকে বলা হয় "কোতা" (Kota), "কোতা" মানে দুর্গ। আরব দেশ ভ্রমণের সময় আরবদ্বারা নির্ম্মিত ছোট এবং বড়, পুরাতন এবং নূতন অনেক দুর্গই দেখেছি, সেই দুর্গগুলির কাছে গিয়ে তাদের নির্ম্মাণকৌশল নিরীক্ষণ করেছি। তাতে দেখতে পেয়েছি ছোট এবং বড় নানারকমের পাথর দিয়ে সেই দুর্গগুলি তৈরী হয়েছিল, দরকার অনুযায়ী পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল, এতে পরিপাট্যের কোন বালাই ছিলনা। গ্রীকদের তৈরী অনেক বিল্ডিং আমি দেখেছি এবং লক্ষ্য করেছি গ্রীক বিল্ডিং-এও একজাতীয় এক রংএর পাথরের ব্যবহার ছিল না। আরব, গ্রীক এবং অন্যান্য পুরাতন সভ্য জাত প্রায়ই পাথরের উপরে প্লাষ্টার করত, সেজন্য তাদের পাথরের রং বিচারে কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ন্যাসালেক্-এর পূর্ব তীর হতে জাম্বাবীর ( Zimbabw ) ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত যে সকল বহু পুরাতন বিল্ডিং দেখতে পাওয়া যায় তার গঠন প্রণালী একই ধরণের এবং তাতে যে সকল প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল তার আকৃতি, রং ও পাথরের জাত একই। এসম্বন্ধে জাম্বাবীর ধ্বংসস্তূপ নিয়ে যখন কিছু বলা হবে তখন বিশদভাবে বলবার ইচ্ছা রইল।

ন্যাসাল্যাণ্ডের নিগ্রোরা মেথর প্রথা প্রবর্তন করতে কোন মতে রাজী হয়নি, সেজন্য ন্যাসাল্যাণ্ডে ধনিকসম্প্রদায় বাধ্য হয়ে এক নূতন ধরণের পায়খানা-প্রথা অবলম্বন করেছেন। সেই প্রথা যদি ভারতে প্রবর্তিত হয় তবে ভারতেও মেথরদের প্রয়োজন হবে না। এই

প্রথাটি সহরে, নগরে ও গ্রামেও প্রবর্তন করবার সব সুবিধা রয়েছে। জুম্বা সহরে প্রত্যেক বাড়ীতে একহাত প্রশস্ত একটি কূপ খনন করা হয়। প্রত্যেকটি কূপ দশ হাতের বেশী গভীর নয়। কূপ-গুলিকে বড় বড় পাথর দিয়ে ভর্ত্তি করে ফেলা হয়। তারপর উপরে মুখটিকে 'সিমেন্ট'এর পাথর দিয়ে গাথনি করে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। এরূপ তৈরী যতগুলি পায়খানা দেখেছি সব-গুলি গন্ধহীন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভারতের হরিজনদের যদি উন্নতি করতে হয় তবে ন্যাসাল্যাণ্ডের প্রথামতে পায়খানা গঠন করলে এক শ্রেণীর হরিজনভুক্ত লোক মিলবে যারা নূতন কাজ-কর্ম্মের সন্ধান করে নূতনভাবে তাদের জীবন সুখেস্বচ্ছন্দে কাটাবার সুযোগ পাবে। মহেন্দ্রবাবু আমাকে নিয়ে সহরের সর্বত্র বেড়িয়ে এসে বললেন—হরিজনের উন্নতি যদি করতে হয় তবে উল্লিখিত মতে গ্রাম ও সহরের উন্নতি না করলে হরিজনের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

জুম্বা সহরে তিন দিন কাটিয়ে ৪র্থ দিন প্রাতে লিম্বী যাই এবং সেখানেও এক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণও একটি নিগ্রো মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বর্তমানে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তার বাড়ীতে ছোট একটি ধর্মশালা রয়েছে। সেই ধর্মশালায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকেই থাকতে এবং খেতে দেওয়া হয়। আমার লিম্বীতে পৌছার আগেই মিঃ মোহাম্মদ লিম্বীতে পৌছেছিলেন এবং আমি যে পণ্ডিতজীর বাড়ীতে থাকব সেকথা জানিয়েছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম মিঃ মোহাম্মদ মিঃ লছমন এবং পণ্ডিতজীর বেশ প্রণয় রয়েছে। তার কারণ সকলেই নিগ্রো স্ত্রীলোক বিয়ে করেছেন। ইণ্ডিয়া সমাজ

তাঁদের প্রত্যেককে পরিত্যাগ করেছে বলেই বোধ করি এঁদের মাঝে এত বন্ধুত্ব আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। লিম্বীসহরে দেখবার মত কিছুই ছিল না, সেজন্য সেখানে দুদিন থেকেই আমি "পোর্ট হেরল্ড"-এর দিকে রওয়ানা হই।

অনেকে আমাকে বলেছেন, "দেখুন মশায়, আপনার ভ্রমণ-কাহিনীতে যে সকল স্থানের নাম থাকে ম্যাপে তা পাওয়া যায় না।" কথাটা অতীব সুন্দর এবং সরলতায় পূর্ণ। এ কথাটার উত্তরে আমি বলব, "বিদেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অতি সামান্য জ্ঞান থাকার জন্য, আমাদের এই দুর্দশা। আমাদের দেশের দেওয়াল পন্‌জীতে দেবদেবীর ছবি থাকে, রাষ্ট্র নায়কদের ছবি থাকে, কিন্তু জাপানে, তুর্কীয়ায় এবং বর্তমানে ইরানের দেওয়াল পন্‌জী দেশবিদেশের ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ থাকে। লোকশিক্ষা দেবার এটাও একটা প্রকৃষ্ট উপায়। জাপানে দেওয়াল পন্‌জী নাই বললেও চলে, কিন্তু লোকশিক্ষা দেবার জন্য জাপানীদের পাইখানায় বিদেশের মানচিত্র সম্বলিত দেওয়াল পন্‌জী এবং দুর্গন্ধ নাশের জন্য এক প্রকারের সাবান থাকে। যারা জাপানে জাপানীদের ঘরে থেকেছেন তারাই এই সত্য জেনেছেন। বিদেশের লোক শিক্ষার্থে নানারূপ উপায় উৎভাবন করে, আর আমরা গণেশ ঠাকুরকে জল দিয়ে ভাগ্য ফেরাতে চাই, সরস্বতীকে ফুল দিয়ে জ্ঞানার্জন করতে চাই, সেজন্যই আমার ভ্রমণ কাহিনীর স্থানগুলির নাম সকলে ম্যাপ খুলেও দেখতে পান না।"

আজকে আর একটি স্থানের নাম বলছি, সেই স্থানটির নাম ফুল পোর্ট-হেরল্ড। পোর্ট শব্দের অর্থ বন্দর। কিন্তু যেস্থানে পোর্ট-হেরল্ড অবস্থিত তার আশে পাশে কোথাও জল নাই। প্রকৃত পক্ষে স্থানটি

হল একটি রেল স্টেসন। পোর্ট-হেরল্ড হতে অন্তত পক্ষে দুশ মাইল পূর্বে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। এখন যদি এই স্থানটির নাম কেউ মানচিত্রে সাগর তীরে অন্বেষণ করেন তবে নিশ্চয়ই বিফল মনোরথ হবেন। অথচ এই স্থানটির চমকপ্রদ কাহিনী আমার না বললেও চলে না। যারা মনে করেন, ভ্রমণ-কাহিনী, উপন্যাস জাতীয় বই তারা দয়া করে আর ভুল করবেন না। এতে উপন্যাসের কিছুই নেই। এত হায় আপস্সুস্ করারও কিছু নেই। ভ্রমণকাহিনীতে কথা-শিল্পেরও বিকাশ হয় না। এসব জেনে শুনে ভ্রমণকাহিনীতে চোখ বুলানো উচিত।

যদি কেঁউ দয়া করে বেশ ভাল মানচিত্র এমন কি ওটোমেবিল মানচিত্র খুলেন তবে দেখতে পাবেন লিমবী হতে পোর্ট-হেরল্ড পর্যন্ত বেশ সুন্দর রেললাইনের চিহ্ন দেওয়া আছে। তা কিন্তু ঠিক নয়, এখনও এই পথটাতে রেললাইন বসানো হয়নি। কখন যে হবে তাও বলা কষ্টকর। আমরা যদি কাগজেপত্রে মিথ্যা কথা বলি, তবে যাঁদের দ্বারা গভর্ণমেন্ট পরিচালিত হয় তাঁরা আমাদের শাস্তি দেবার বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু তাঁরা যখন সেরূপ কিছু করেন তখন তাঁদের পক্ষে শাস্তি পেতে হয় না, ভুল হয়েছে বলে স্বীকারও করেন না। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে।

লিম্বী হতে পোর্ট-হেরল্ড পর্যন্ত পথটুকু পর্বতময় এবং ক্রমেই পোর্ট-হেরল্ডর দিকে ঢালু। পথের দুপাশে বন্য জীবের বাসস্থান। পথ চলতে চলতে দেখলাম একটা সিংহ তনয় আমাকে দেখে হাসছে এবং তারপরই সে মাটিতে বেশ গড়াগড়ি দিতে থাকে। সিংহ তনয়ের আমার প্রতি এরূপ উপহাস আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সেদিন শরীর এবং মনের অবস্থাও খারাপ ছিল। সিংহ তনয়কে

প্রায় এক শত গজ দূরে রেখে আমিও বাঁদিকে চেয়ে সাইকেল চালাতে লাগলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সিংহের বাচ্চার মা বাবা এবং ভাই বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। তখন আমার মন হতে অবাস্তব ভাবের লোপ পায় এবং চিন্তা হয়, সিংহপরিবার যদি আমাকে আক্রমণ করে তবে আমার অবস্থা হবে একটি মরাগরুর চারিপাশে ঘেরে শকুনীদের মতই। মনে চিন্তা হচ্ছিল আর পা পুরাদমে সাইকেলের পেডেলে চাপ দিচ্ছিল। সিংহপরিবারকে এড়িয়ে যাবার পর একটি গ্রামের কাছে পৌছে সাইকেল হতে নামলাম এবং বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

গ্রামটি বেশ বড়। দূর থেকে বংগদেশের গ্রামের মতই দেখায় চার চালার, গোল চালার ঘরগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নীচের দিকে চলে গিয়েছিল। বাংলা দেশের ঘরগুলি শ্রেণীবদ্ধ নয়। আর ওদের ঘরগুলি শ্রেণীবদ্ধ। বাংগালীরা কেন যে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ঘর তৈরী করেনি তার কারণ আমার জানা আছে, তবে এখানে এসব কথা বলার নয় বলেই বললাম না। প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালগুলি মাটির আর উপরে খড়ের চালা। চালায় ছন্ এবং খড় উভয়ই দেওয়া হয়েছে। বিচালী ব্যবহারের প্রথাটাও বেশ পরিষ্কার এবং আমাদেরই মত।

গ্রামের কয়েকটি দোকান ছিল, থাকবার হোটেল ছিল না। খাবারের দোকানে গিয়ে বসলাম। দেখলাম উত্তম ঘৃতে বড় বড় রুটি ভেজে তা বিক্রি করা হচ্ছে। নানারূপ মাংসেরও তরকারী ছিল, আমি সেদিকে না তাকিয়ে দুখানা রুটি কিনে দুধ এবং চা যে দোকানে বিক্রি হয় সে দোকানে গিয়ে বসলাম। দেখলাম, আমারই মত অনেকে খাবারের দোকান হতে শুধু ভাজা রুটি নিয়ে গরম দুধের অপেক্ষা করছে। দুধ গরম হয়ে গেলে অনেক গ্লাস

গরম দুধ বিক্রি হল। আমারই মত অনেকে গরম দুধ এবং ঘিয়ে ভাজা রুটি খেল।

খাওয়া হয়ে গেলে, একটি নিগ্রোকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখানে বিশ্রাম করার স্থান কোথাও আছে?" একটা লোক খালি মেজে দেখিয়ে বলল, "এতেই শুয়ে থাক।" লোকটিকে কিছু না বলে সাইকেলখানা ঘরের সামনে এনে পিঠ-ঝোলা হতে একখানা উত্তম কম্বল বের করে তাই মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভূমি শয্যা, আর ভূমিতে বসে খাওয়া মান্ধাতার যুগের সভ্যতা। যদিও নিগ্রোরা টেবিল চেয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে তবুও তারা এখনও চৌকী ইত্যাদি ব্যবহার করতে শিখেনি। মাচাং তৈরী করা তারাও জানে তবে মাচাংএর ব্যবহার খুব কমই করে। আমরা চৌকী অর্থাৎ তক্তোপোষ ব্যবহার করেই ভাবি বেশ সভ্য হয়েছি, আমাদের আর্থিক উন্নতি বেশ হয়েছে আসলে আমরাও কিন্তু সভ্যতার চরমে উঠতে পারিনি।

কতক্ষণ বিশ্রাম করার পর হঠাৎ একখানা মোটরের শব্দ শুনে পথের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম একখানা মোটরবাস আসছে। ইচ্ছা হল না আর সাইকেল চালিয়ে অগ্রসর হই। মোটর চালকের সংগে ঠিক হল সে আমাকে Rail Head পোর্ট-হেরল্ডে পৌছে দেবে এবং সেজন্য পাঁচ শিলিং নেবে। আমি তৎক্ষণাৎ সাইকেলখানা নিয়ে এসে বাসের পেছনে বেঁধে ফেললাম এবং সামনের দিকে সিটে গিয়ে বসলাম।

বাস ছেড়ে দিল। লক্ষ্য করে দেখলাম নিগ্রোদের মনে কোনরূপ কুসংস্কার ঢুকেনি। তারা কেউ ঠাকুর দেবতার নাম করে লম্বা ভ্রমণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য প্রার্থনা করল না। গাড়ীখানা বেশ

এঁকেবেঁকে গিয়ে সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়ল। এবার মোটর বাস প্রবল বেগে চলল। সমতল ভূমির দুদিকে বড় বড় বৃক্ষরাজি ঢেকে রাখছিল। এরূপ স্থানে হিংস্র জীবের বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। মোটর বাস পাবার জন্য মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম। ক্রমেই দিনের আলো নিবে যেতে লাগল। সন্ধ্যা হল। তারপর সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকারের আবরণ আরও গাঢ় হয়ে উঠল। পথের দুপাশে জোনাকী পোকা ঝিকমিক্ করতে লাগল। মোটর বাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, তবে যাত্রীরা এসেই একে অন্যের গা ঘেঁসে বসতেছিল। তারা যে ভয় পেয়েছে তা বেশ অনুভব হয়েছিল! সে ভয়ের কারণ কি? আফ্রিকাতেই শুধু কি সে ভয়ের কারণ রয়েছে? শুধু আফ্রিকাতে সে ভয়ের কারণ সন্নিবদ্ধ ছিল না, পৃথিবীর বনে জংগলে সর্বত্র এই ভয়ের কারণ সন্নিবদ্ধ রয়েছে।

রাত দশটার সময় বাস আলোকসমন্বিত একটি স্থানে আসল। বুঝলাম এটাই পোর্ট হেরল্ড। আমিও বাস হতে নামলাম। ভাবলাম এখানে নিশ্চয়ই কোথাও একটি শোবার স্থান (হোটেল) পাব। কিন্তু এখানে তা নাই। আহারের স্থান রয়েছে, শোবার স্থান নেই। ঘর ভাড়াও পাওয়া যায় না। একজন নিগ্রো বলল, "বানা নিকটেই শ্বেতকায়দের হোটেল আছে।" নিগ্রোদেরই মতে আমিও শ্বেতকায়ই ছিলাম। তারা যদি জানত আমি তাদেরই মত শ্বেতকায়দের দ্বারা অপমানিত হই তবে তারা আর একথা বলত না।

অনেক চিন্তা করে রেলস্টেশনে গিয়ে বিশ্রাম করাই ঠিক করলাম। রেল স্টেশনে যাবার পর শ্বেতকায় স্টেশন মাষ্টার বলল, "এখানে আর থাকবার কোন বন্দোবস্ত হবে না, আমি একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পার্ট-

মেন্ট খুলে দিচ্ছি তাতেই সমুদয় আরাম পাবেন। সকাল বেলা এখান থেকে গাড়ি ছাড়বে এবং বেরা যেতে পারবেন।”

বিনা আপত্তিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে উঠে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে স্নানাগারে গিয়ে বেশ ভাল করে স্নান করে, স্থানীয় নিগ্রো খাবারের দোকান থেকে একটি নিগ্রো বয়কে খাবার আনতে বললাম। লোকটির বয়স বেশ হয়েছে। আমার কষ্ট সে বেশ অনুভব করেছিল। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, “রাইস্ ক্যারি আনব কি?” আমি বললাম, “অনুগ্রহ করে তাই করবেন, আর যদি পারেন তবে কিছুটা ফল এবং দুধ নিয়ে আসবেন।” বয় মাথা নেড়ে চলে গেল, আমিও গাড়ির খিরকীগুলি খুলে দিয়ে পাখা দুখানা পূর্ণ বেগে ছেড়ে দিলাম।

প্রৌঢ় বয়স্ক বয় বুদ্ধি করে সকল জিনিসই এনেছিল। মাংসও ভেড়ারই ছিল। কাঁটা চামচ আনতে ভোলেনি। তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্রটি মস্ত বড় একখানা ট্রে এবং একখানা টুল নিয়ে এসেছিল। ভাত, মাংসের ঝোল, নানা রকমের ফল এবং মস্তবড় এক বাটি গরম দুধ পেয়ে বয়ের কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। খাওয়া হয়ে গেলে বয় আমার কাছ থেকে পাঁচ শিলিং নিয়ে বিদায়ের পূর্বে বলল—“মহাশয় শোবার পূর্বে ভাল করে খিড়কীগুলি বন্ধ করবেন নতুবা নেকড়ে আক্রমণ করে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।” বয়ের কথা শুনে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম আর অদূরে ইউরোপীয় হোটেলের নৃত্য দেখতে লাগলাম। ইউরোপীয়দের প্রতি অনর্থক রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা যদি মানুষ হই তবে ইউরোপীয়গণ আমাদের অমানুষ করে রাখতে সক্ষম হবে না। আমাদের সকল রকম সংঘবদ্ধ না হওয়াই হ'ল আমাদের অনুন্নতির একমাত্র কারণ। আমি

গাড়িতে বসে তারই কথা অনেকক্ষণ ভেবে, খিড়কীগুলি বন্ধ করে দিয়ে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আফ্রিকার জংগলে পাখীর কলরব বেশ আছে। তবে কাক নেই। সূর্য উঠার সংগে সংগেই, কতকগুলি পাখী কলরব আরম্ভ করে দিয়েছিল। রেল ষ্টেশনের শ্বেতকায় ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় অতি প্রত্যুষে উঠেই কতকগুলি নিগ্রোকে "ডেম্ ফুল্" বলে গাল দিচ্ছিলেন, আর নিগ্রোরা অবনত মস্তকে "ইয়া বানা, ইয়া বানা" করছিল। এরূপ দৃশ্য ইউরোপে দেখা যায় না, তবে ভারতে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই সেরূপ কুকথা ব্যবহার করতে শুনেছি। সেজন্যই শ্বেতকায়টার প্রতি ঘৃণা হ'ল না। আফ্রিকাতে আমি হাত জোড় করে কাউকে নমস্কার বলতাম না, এবং ইউরোপীয়ানরা যে পর্যন্ত আমাকে গুডমর্নিং না বলত সে পর্যন্ত আমিও কিছু বলতাম না। কম্পার্টমেণ্টের কাছে দাঁড়িয়ে যখন ইউরোপীয়ান ষ্টেশন মাষ্টার "ডেম্ ফুল্" করছিল তখন আমাকে দেখতে পেয়ে তার রাগ আরও বেড়ে যায়। সে ভেবেছিল আমিই তাকে সাদর সম্ভাষণ করব, কিন্তু তা না করে তার দুর্ব্যবহারের জন্য মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম।

কতক্ষণ পর সে-ই এসে আমাকে "গুড মর্নিং" বলে বলল "মশিয়ে, এটা এশিয়াটিকদের জন্য নয়, আরও দুখানা গাড়ি পেছিয়ে গেলে আপনাদের রিজার্ভ গাড়ি দেখতে পাবেন।" মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়ে তৎক্ষণাৎ কম্পার্টমেণ্ট পরিবর্তন করলাম। একটি নিগ্রো বয় আমাকে সাহায্য করল। কতক্ষণ পর সাইকেলখানা একেবারে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত বুক করে গাড়িতে এসে বসলাম। শুনতে পেয়েছিলাম ব্যারাতে বর্ণ-বৈষম্য নেই, সেই আশায় বুক বেঁধে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম।

ঠিক বেলা নটার সময় কয়েকজন ইউরোপীয় যাত্রী এসে তাদের নির্দ্ধারিত কম্পার্টমেণ্টে উঠলেন। আমি তখন গাড়ি হতে নেমে নিগ্রোরা গাড়িতে কি করে বসে তাই দেখতে লাগলাম। নিগ্রোদের কম্পার্টমেণ্টে বসবার বেঞ্চ ছিল না। শুধু কতকগুলি চাটাই বিছানো। কম্পার্টমেণ্টের কোনও খিড়কী ছিল না। দেখলেই মনে হয় এটা একটা মাল বোঝাই করার গাড়ি। এরই মধ্যে তারা উঠে বসতে লাগল। একটা কম্পার্টমেণ্ট লোকে ভর্তি হয়ে গেলে অন্য আর একটার দরজা খুলে দেওয়া হল। গরু ভেড়ার মত যখন কয়েকখানা মালগাড়ী বোঝাই হল তখন গাড়ী ছাড়বার সময়ও হয়ে এসেছিল।

গাড়ি ছাড়ার পর বয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, কারণ ডাইনিং কারে এশিয়াটিকরা যেতে পারে না। এশিয়াটিক বলতে প্রকৃত পক্ষে এখানে ইণ্ডিয়ান, আরব এবং সোমালীদের বুঝায়। যে সকল আরব ইউরোপীয় পোশাকে এসেছিল তারা কিন্তু ইউ-রোপীয়দের সংগেই বসবার অধিকার পেয়েছিল। এদিকে আরবদের মধ্যে সাদা আরবই বেশি। সাদা আরবদের শুধু নাকটাই ইহুদীদের মত। তাদের অন্যান্য অবয়ব ইউরোপীয়ানদের মতই। আফ্রিকাতে ইহুদীরা শ্বেতকায়দের কাছে সমান ব্যবহার পায়।

গাড়ি ক্রমেই গতি বাড়িয়ে আগিয়ে চলল। আমি দু-দিকের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম। কতক্ষণ পর নীরবতা ভংগ করে একজন ছয় ফুট উচ্চ অর্দ্ধ নিগ্রো বয় আমার কম্পার্টমেণ্টে এসে জিজ্ঞাসা করল সকাল বেলা আমি কি খেতে চাই। যে সকল খাদ্য আমি চেয়েছিলাম বয় তা এনে দিয়ে আমারই সাম্নের বেঞ্চে বসবার অনুমতি চাইল। আমি তাকে বসতে বললাম। আমার খাওয়া হয়ে

গেলে বয় আমাকে জিজ্ঞাসা করল ছুৎমার্গ মানে কি হয় জানতে চাই, বানা। আমি তাকে সংক্ষেপে বললাম "এটাও বর্ণ-বৈষম্যেরই একটা অংশ।" বয় চলে গেলে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলাম। সত্য কথা বলবারও যে সাহস কমে গেছে? প্রতিজ্ঞা করলাম "এরূপ মিথ্যা কথা আর বলব না।" কেপ টাউনে যাবার পর আর্গাস্ নামক এক সংবাদপত্র আমার সত্য কথা বলার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখেছিল। আমি তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম এটাও সাম্রাজ্যবাদেরই একটা অংশ। এই মারাত্মক ব্যাধি যাতে করে পৃথিবী হতে লোপ পায় তারই চেষ্টা করা উচিত। আর্গাস্ তা না করে, ভারতের কুপ্রথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পরে পুনরায় প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, এ সব বদখেয়ালীর জন্যই সোভিয়েট রুশ সাম্রাজ্যবাদী মতবাদে দুষ্ট এবং পুষ্ট সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের তাদের দেশে স্বাধীনভাবে বেড়াতে দেয় না। আর্গাস্ আমার পত্র ছাপিয়ে ছিলেন। বৃটেনে কিন্তু সেরূপ প্রতিবাদপত্র ছাপানো হয় না। বৃটেনে যাবার পর সেরূপই একটা ঘটনা ঘটেছিল এবং তার প্রতিবাদও করেছিলাম। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনে নি।

ঠিক বেলা তিনটার সময় আমরা বৃটিশ সীমান্ত পার হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এবার অশ্বেতকায়রা ডাইনিং কারে গিয়ে খেতে পাবে। কিন্তু তা হতে পারল না। এই রেলগাড়ী বৃটিশের। বৃটিশের রেলগাড়ী পর্তুগীজদের দেশে গেলেও কালার-বার নিয়মটি বজায় রেখেই চলে। পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকাতে বর্ণ-বৈষম্য নেই বলেই ঘোষণা করা হয়, কিন্তু সেখানে যাবার পর যা দেখলাম তাতে মনে হয়েছিল, কালোয় আর সাদায় সহজে মিশ খাবে না।

পরের দিন সকাল বেলা গাড়ী ব্যরাতে গিয়ে পৌছল। গাড়ী হতে নেমে সাইকেলের সন্ধানে গেলাম। কেউ আমার কথা বুঝতে চাইছিল না, কারণ এখানে যারা ইংলিশ ভাষা অবগত ছিল তারা ইংলিশ ভাষাতে আমার সংগে কথা বলা অপমানজনক মনে করছিল। ইংলিশদের সংগেই পর্তুগীজরা ইংলিশ কথা বলে, ইংলিশদের প্রজার সংগে তারা সেই সম্মানিত ভাষা ব্যবহার করতে রাজি ছিল না।

আমি যখন আমার সাইকেল খুঁজছিলাম, তখন একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সংগে সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে আমি আমার পরিচয় দেওয়া মাত্র তিনি আমাকে রেলের গুদামে নিয়ে যান এবং সাইকেল এখানেই পাওয়া যাবে বলে চলে যান। আমি যখন সাইকেলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন একজন পর্তুগীজ ভদ্রলোক এসে বললেন "ঐ যে সাইকেলখানা, এটা আপনারাই?" "হাঁ, এটা আমারই।" পর্তুগীজ ভদ্রলোক আমাকে বসতে দিয়ে বললেন, "আমরা ভারতবাসীদের জাত্যভিমান দেখাই না। তবে নিগ্রোরা আমাদের এক সংগে বসে খেতে সাহসও করে না এবং আমরাও তাদের এক সংগে খেতে দেই না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসী যে রংগের লোকই হোক না কেন পর্তুগীজ ইষ্ট আফ্রিকাতে কোনরূপ বর্ণ-বৈষম্যের আওতায় আসে না।"

আমার সাইকেলখানা মুক্ত করে কাষ্টাম হাউস হতে একটু বেড়িয়ে এসেই ফের সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। তিনি বিনা ভূমিকাতে বললেন, এখন চলুন আমার সংগে, আমার বাড়িতেই থাকবেন। বিনা বাক্য ব্যয়ে তার পেছন নিলাম। ভেবেছিলাম তার বাড়ি শহরেরই কোথাও হবে। কিন্তু তিনি যখন শহর ছেড়ে গ্রাম্য

পথ ধরলেন তখন বুঝতে পারলাম, তিনি গ্রামেই বাস করেন। ধান ক্ষেতের আইল ধরে ছোট ছোট পথ চলেছে। আমরাও সেই আইল ধরেই চললাম। মাঝে মাঝে কাঁদাও পেতে লাগলাম। সাইকেলের সাহায্যে আমি কাদা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম আর মান্দ্রাজী ভদ্রলোক ঘুরে এসে আমার সংগে মিলছিলেন। আধ ঘণ্টা চলার পর আমরা একটি গ্রামে আসলাম। গ্রাম সমুদ্র হতে যদিও চার মাইলের কম দূরে অবস্থিত ছিল না, কিন্তু যখনই জোয়ার আসত তখনই জল গ্রামের কাছে এসে যেত।

গ্রামে পৌঁছে ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে উঠলাম। ভদ্রলোকের নাম ছিল লসমনম্। তিনি একজন অর্দ্ধ নিগ্রো স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেছিলেন। আমাকে যে স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা হল তার বিলাসভবন। বিলাসভবনে তখন লোক ছিল না, তিনিও থাকবেন না বলেই বললেন। আমার জন্য খাবার এবং গরম জলের ব্যবস্থা তার বাড়ি হতে হবে বললেন। এবং সারাটা ঘর আমার কাছে ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি বিদায় নিলেন। ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম উত্তম শয্যা পাতা রয়েছে। ঘরের ভেতর আসবাবের অভাব মোটেই ছিল না। ঘরখানা দেখা হয়ে গেলে পাশের কুয়া হতে জল উঠিয়ে ঠাণ্ডা জলেই স্নান করলাম এবং ঘরে এসে বসামাত্র দেখলাম কে আমার জন্য খাবার এনে রেখে চলে গিয়েছে। আমিও দেরী না করে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করার পর পাশের ঘরে উপবিষ্ট একজন ইউরোপীয়ানের সংগে দেখা করলাম। ইউরোপীয়ানটি আমাকে সাদরে বসতে দিল এবং নানাদেশের গল্প বলে আমাকে আপ্যায়িত করতে লাগল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, প্রায়ই আমাকে "স্যার" বলছিল। আমাকে কেন এত সম্মান দেখাচ্ছে তার কোন কারণই খুঁজে

পাচ্ছিলাম না। আমি কিন্তু লোকটিকে একবারও 'স্যার' বলিনি। যা হোক ইউরোপীয় লোকটির কাছ থেকে ব্যরার অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে ঘরে এসে শুয়ে পড়ছিলাম।

বিকেল বেলা বড় পথে শহরের দিকে যেতে লাগলাম। আমি যে পথে চলছিলাম সেই পথটার দু'দিকে ধানের ক্ষেত। লোকালয় দু-একখানা ছিল মাত্র। আধ মাইল পথ গিয়েই একটি গুজরাতী মুসলমানের বাড়ি পেলাম। বাড়ির সামনে দোকান। দোকানে গিয়ে দোকানীর কাছে শহর সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নিলাম, তারপর শহরে গেলাম। শহরের ভেতর দিয়ে একটা রেলপথ চলে গিয়েছে। এরূপ রেলপথে চলাফেরা করার ব্যবস্থা পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজদের মধ্যেই এখনও প্রচলিত আছে। এদের মত ভীরু সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীতে আর নেই। কি জানি তাদের প্রজা অনেক কিছু শিখে ফেলে, সে ভয়েই তারা অস্থির, সেজন্য তাদের শাসিত রাজ্যে শিক্ষার এবং বর্তমান যুগের উপযুক্ত ট্রাম এবং বাস সার্ভিসের প্রচলন পছন্দ করে না। দারজিলিং হিমালয় লাইনের মত ছোট্ট গাড়ি চালিয়েই পর্তুগীজরা সন্তুষ্ট।

ব্যরা শহরটি বেশি বড় নয়। সমুদ্রতীরের বালুকারাশির উপর শহরটি অবস্থিত বলে দ্বিপ্রহরে শহরে বাই-সাইকেল চালানই কষ্টকর হয়ে উঠত। প্রথম দিন সেজন্য আমি কোনও ভারতবাসীর সংগে সাক্ষাৎ না করে শহরটির চার দিকের পথ ঘাট দেখেই চলে আসি। শহরটি দেখে মনে এমন কোন দাগ কাটল না যার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা যেতে পারে।

শহর থেকে ফেরবার পথে একটি পীচ দেওয়া পথ দেখে সেদিকে আগিয়ে চললাম। পথটির দু'পাশে পর্তুগীজ, অর্দ্ধ নিগ্রো এবং

ভারতবাসীদের বাস দেখে সাইকেল হতে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে লাগলাম। যখন আমি পথ ধরে চলছিলাম তখন একজন অর্দ্ধ নিগ্রো আমার কাছে এসে ইংলিশে বলল "এদিকে আসুন"। তার কথা শুনে মনে বেশ আনন্দ হল এবং তার ঘরে গিয়ে বসলাম। লোকটিকে দেখে মনে হয়েছিল তার বয়স পঁচিশ ত্রিশ হবে কারণ তাকে দেখতে সেরূপই মনে হয়েছিল। তার বয়স জিজ্ঞাসা করে কিন্তু আমার ধারণা বদলাতে হয়েছিল। তার বয়স মাত্র সতের ছিল। আরও আশ্চর্য হয়েছিলাম ছেলেটির পিতা নিগ্রো জেনে।

ছেলেটির মা-বাবা ভাই-বোন সকলে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং বিদেশ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। মাঝে মাঝে আমিও তাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। নিগ্রো লোকটি ছিল সূত্রধর। সুতারের কাজ করে নিগ্রো সূত্রধর পর্তুগীজ সুতারের মাইনের দশমাংশ সপ্তাহে পেতেন। এও পেতেন না যদি তার স্ত্রী পর্তুগীজ না হতেন। এতে বুঝা গেল বর্ণ-বৈষম্যের ফলে নিগ্রোদের অল্প মাইনে দেওয়া হচ্ছে। কথাটা শুনে দুঃখিত হলাম না কারণ এদেশে একটা কিছু উপলক্ষ করে কম মাইনে দেয়, আমাদের দেশে অথবা অন্যান্য সভ্য দেশে কিন্তু সেরূপ উপলক্ষ না করেই এশিয়াবাসীদের অল্প মাইনে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শুনেছিলাম পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকাতে বর্ণ-বৈষম্য নাই, কিন্তু এখন দেখলাম একদিকে না হয় অন্য দিকে ধনীরা মজুর ঠকাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেই। আমি যখন তাদেরই কথা সমালোচনা করতে লাগলাম তখন একটি মেয়ে নাকে মুখে ক্রশ এঁকে বললে, "এটা ভগবানের ইচ্ছা।" আমরাও দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলি "যা কপালে লেখা ছিল।"

নাম না জানা পথটি পরিত্যাগ করে যখন ঘরে আসলাম তখন পূর্বপরিচিত ইউরোপীয়ান লোকটি আমার কাছে এসে বললেন "মুশাহ আপনি আমাকে ভুল করে সমীহ করে চলবেন না, আমিও একজন নিগ্রো। এদেশে আমার যে অধিকার একজন কুচকুচে কালো লোকেরও সেই অধিকার। আমার জন্ম হল "সেন্ট হেলেনা", হালে আমি এদেশে এসেছি। লোকটির কথা শুনে আমার বিশ্বাস হল না. সেজন্য লস্মনমের বাড়িতে দৌড়াতে হয়েছিল। লস্মনম্ বলেছিলেন "হাঁ সত্যিই লোকটি শ্বেতকায় নয়, তবে সেন্টহেলেনাতে শ্বেতকায়দের শরীরে সামান্য নিগ্রো রক্ত থাকার জন্য নিগ্রোদের মতই ব্যবহার পেয়ে থাকে।

এ যে দমিত মন। এ মনে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, জ্বলবে বেশ। শুধু নিজে প্রজ্বলিত হবে না, যে দিকে যাবে সেদিকেই আলো করে চলবে। এই ভেবে আমি তার সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে প্রয়াসী হলাম। যারাই দমিত, পদদলিত তারাই নাচ-গান-হল্লা নিয়ে সময় কাটাতে চায়। শুধু তাই নয়, কাম রিপুর এরাই হয় পয়লা নম্বর উপাসক। আমি ঠিক করলাম, এর মনে যদি আসন পেতে বসতে হয় তবে তারই মত হয়ে কয়েক দিন চলতে হবে। প্রথম কয়েক দিন আমি তাকে নিয়ে সিনেমায় গেলাম। ফিরে আসার পথে পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকায় উত্তম সুরাও পান করতে ভুলিনি। তারপর ঘরে এসে রাত তিনটা পর্যন্ত দেশবিদেশের গল্পে লোকটাকে মাতিয়ে রাখতাম। যারা একটু সচেতন এবং বেপরোয়া তাদের মনে উচ্চ আশা থাকে এবং আগুন ধরে অতি সত্বর। ড্যানিয়েল সে জাতীয় লোক। কিন্তু সে কোন্ পথে যাবে? সাদা না কালো। সাদা পথে পুঁজিবাদীর ধাপ্পাবাজী।

তার কালো পথে কোন বাধা বিঘ্ন ছিল না। আমি সাদা লোকটিকে কালো পথ দেখিয়ে দিলাম।

উপন্যাস যেমন মানুষকে নেশাক্ত করে পর্যটকও তেমনি মানুষকে মা য়ে তুলতে পারে। আমার ভ্রমণের সুখের কথা শুনে লোকটি মেতে উঠেছিল, কিন্তু যখন আমার মন তার কাছে খুলে ধরলাম তখন সে দেখতে পেল তাতে লক্ষ লক্ষ ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। আমি ড্যানিয়েলকে বুঝিয়ে বললাম এই যে ক্ষত-চিহ্নগুলি দেখছ তার একটি চিহ্নও তোমার মনে আঁকতে হবে না। যদি কায়মনবাক্যে পলিটিক্স কর তবে হয় এমনি একটি ক্ষত চিহ্নের বদলে তোমার বুকে একটি বুলেট পড়ে তোমার সকল জ্বালা লোপ করে দেবে। নয় ত যা চাও তাই পাবে। বল এখন কোন্‌টা চাও? ড্যানিয়েল আর কথা বাড়ায় নি, সে রাজনীতি বিষয়ক পুস্তক পাঠে এমনি ভাবে মন দিয়েছিল যে আর তার ঘরে আর উপন্যাস, কাব্য, এ সব দেখা যেত না। ড্যানিয়েল ছিল ব্যবসায়ী। সে ব্যবসা পরিত্যাগ করেছিল। আমি চলে যাবার পর সে নাকি গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম সামান্য টাকার মোহ তাকে আর বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়নি। সে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য স্বাধীন ভাবে সর্বত্র নিগ্রোদের কাছে যাচ্ছিল।

ব্যরা (BEIRA) শহরটি ছোট হলে কি হবে, অনেকগুলি ভারতবাসী বাস করে। পরের দিন থেকে ভারতবাসীদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগলাম। চীনারা যখন বিদেশে যায় তখন তারা দলাদলি করে না। ভারতবাসী কিন্তু স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র সমান। ধর্মের বিভিন্নতা ত আছেই, উপরন্তু আছে প্রাদেশিকতা। গুজরাতীরা কিন্তু প্রাদেশিকতা মোটেই পছন্দ করে না, সেজন্য তাদের কাছে

গিয়ে অনেকটা শান্তি পেতাম। মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাতীদের পছন্দ করে না। তার একমাত্র কারণ হ'ল গুজরাতীরা উন্নত আর মহারাষ্ট্ররা অনুন্নত। উন্নত এবং অনুন্নতদের মধ্যে হিংসা লেগেই আছে। আমি এদের এই ছোট গণ্ডীর বাইরে থাকবার চেষ্টা করতাম।

পর্তুগীজ নিয়মমতে কোনরূপ সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ আমি কয়েকজন ভারতবাসীকে সভা করতে বলায় কেউ আমার কথা শুনল না, উপরন্তু আমি যাতে ব্যরা পরিত্যাগ করে সত্বর চলে যাই তারই জন্য লস্‌মনমের কাছে অনুরোধ করতে লাগল। লস্‌মনম্‌ সমাজ বহির্ভূত লোক ছিলেন। কাজ করতেন কন্‌ট্রেক্‌টরী, সে জন্য তিনি অন্যান্য লোকের কথামত কাজ করেন নি, বরং আরও বেশিদিন যাতে ব্যরাতে আমি থাকি তারই জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। আমার শরীর দুর্বল ছিল। আমিও ঠিক করলাম এত বড় উত্তর এবং দক্ষিণ রডেশিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করার পূর্বে শরীরটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। এ দিকেও একা চলা শক্ত হবে, সংগী নেওয়া দরকার হবে, সেজন্য উপযুক্ত সাথীর সন্ধান করতে হবে। অন্ততপক্ষে এখানে তিন সপ্তাহ থাকা আমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ব্যরাতে প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে ছিলাম ও তারপর যখন কোন মতেই সংগী পেলাম না তখন বাধ্য হয়ে ভূস্বর্গ রডেসিয়ার ইম্‌তালী পর্যন্ত রেলগাড়িতে করেই গিয়েছিলাম।

সমাপ্ত